জাতির কর্ম্মী

শ্রীহরিদাস পালিত

গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস্
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা
আশ্বিন,—১৩২২

[মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

ভক্তি-উপহার

যাঁহার কৃপায় আমি কুপথ ছাড়িয়া সুপথ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহার কৃপায় আমার হৃদয় পবিত্র হইতেছে। যিনি ভক্তির ও ত্যাগের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। যাঁহার আপামরে সমান দয়া—সেই দয়াল প্রভুর রাতুল চরণ-কমলে তাঁহারই কৃপায় গ্রথিত এই ক্ষুদ্র বন-পুষ্প-মালা প্রদান করিয়া জীবাধম আমি—ধন্য হইলাম। আমি পঙ্গু হইয়া তাঁহারই কৃপায় গিরি লঙ্ঘন করিতেছি। বামন হইয়া তাঁহারই কৃপায় চন্দ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেছি—আজ ভক্তি-প্রণত-চিত্তে আমার চির-অভিষ্ট গুরুরূপী নর-দেবতার শ্রীচরণ যুগল বন্দনা করি।

দাসানুদাস—
শ্রীহরিদাস পালিত

নিবেদন

ত্যাগ বলং পরং বলম্।

"বঙ্গীয় পতিতজাতির কর্ম্মী"—সত্যমূলক ঘটনার সমষ্টি মাত্র। ইহাতে কাল্পনিক কিছুই নাই। স্থান, কাল, পাত্রের নাম গোপন রাখিয়া এই আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে। 'পতিত জাতির' আত্মকাহিনী—বর্ত্তমান হিন্দুজাতির বেষ্টনীদ্বারা সীমাবদ্ধ পতিত জাতির মর্ম্মকথা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাই ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা বিশ্বপ্রেমিকের নিকট চাষা-ভূষার আবেদন মাত্র। "ছোট জাতি" বলিয়া সমাজে যাহাদের মান্য নাই, 'নগণ্য' বলিয়া ভদ্র-সমাজ যাহাদিগকে ঘৃণা করেন, পদদলিত করেন তাহারা সৎ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে যে 'মানুষ' হইতে পারে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারই আদর্শ মাত্র প্রদত্ত হইল। ভদ্র-বাবু সমাজকে আক্রমণ করা হয় নাই। তাঁহাদের ব্যবহারের উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে। ইহাতে কাহারও নিন্দা বা কুৎসা নাই। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার সহিত বর্ত্তমান কেতাবী শিক্ষার সমন্বয় সাধিত হইলে—ভবিষ্যতে যে শুভ ফল প্রাপ্তির আশা আছে তাহাই দেখান হইয়াছে। শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশবিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয় প্রভৃতির যে নিতান্ত আবশ্যক এবং ভদ্রসমাজের জন্যও ইহার যে টুকু উপকারিতা আছে তাহাই দেখান হইয়াছে। দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিতে হইলে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের দ্বারাই বিদূরিত হইবে তাহার আভাস মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। পতিত জাতিকে উন্নত করিতে না পারিলে—দেশ উন্নত হইবে না। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা তাঁহারা যেন "বঙ্গীয় পতিত জাতির" প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন। আশাকরি লেখকের ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া মহানুভবতা প্রদর্শন করিবেন।

কুচুট—বর্দ্ধমান
আশ্বিন, ১৩২২

বিনীত
শ্রীহরিদাস পালিত

বঙ্গীয় পতিতজাতির কর্ম্মী

প্রথম অধ্যায়

ছোট লোকের পল্লীবেষ্টনী

আমি হিন্দু—জাতিতে নমঃশূদ্র। বঙ্গদেশের বর্দ্ধমান জেলার "স্বাধীনপুরে" আমার জন্ম। ছেলেবেলার অনেক কথা মনে পড়ে কিন্তু পিতার কথা অনেক চিন্তা করিয়াও মনে পড়ে না। আমরা যে ক্ষুদ্র ঘরে বাস করিতাম—সে ঘরখানি একটা ডোবার ধারে, বাঁশঝাড়ের পাশে ছিল। আমার দিদি, আমি ও আমার মা সেই ছোট ঘরটিতে থাকিতাম। আমাদের ঘরের পার্শ্বেই আমাদের স্বজাতিরা বাস করিত। তাহাদেরও অবস্থা আমাদেরই মত ছিল। আমরা যাঁহার মাটিতে বাস করিতাম তিনি ভদ্রলোক—আমাদের মনিব। তাঁহার নাম অভয় ঘোষ, তাঁহার বাটীতে আমার

মা চাকরাণী। দিদি ঘোষ মহাশয়ের ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া বেড়ান—ছেলে মেয়েদের কাপড় চোপড় পরিষ্কার করেন অবশ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেবা করাই তার কাজ ছিল— আর প্রতিদিন তাহাদের বস্ত্রগুলি পরিষ্কার করিয়া জলে ডুবাইয় দিতেন এবং ঘোষগিন্নী সেগুলি লইয়া আসিতেন। মা বাড়ী ঝাঁট দিতেন—গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতেন। ধান সিদ্ধ করা বাসন মাজা, গোবর নেদী দেওয়া, ধানভানা, খারে কাপড় কাচ প্রভৃতি কাজ করিতে হইত। মায়ের মাসিক বেতন আট আনা দিদির বেতন দুই আনা ছিল। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন আমিও মা দিদির অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়া দিতাম আমার মাহিনা ছিল না। দিদি বাড়ীর লোকের পাতের ডাল তরকারি মাখা পরিত্যক্ত ভাত খাইতে পাইতেন। আমিও দিদির সহিত সেই ভাত খাইতাম। তাহাতে ঘোষগিন্নী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয় দিদিকে বকিতেন। মাকে গালি দিতেন—আমার বেশ মনে পড়ে তিনি মাকে প্রায়ই বলিতেন—মুরগীর পাল নিয়ে কি পরের বাড়ী কাজ কর্ম্ম চলে—এ মুরগীর পাল পোষা কি যায়! আমি বুঝিতে পারিতাম আমার জন্যই দিদি ও মাকে তিরস্কার কর হইতেছে। আমি প্রাণপণে তাঁদের ফরমাইস শুনিতাম তত্রাপি তাঁহারা যে কেন তিরস্কার করেন তাহা বুঝিতাম না। আজিও আমার স্মরণ আছে একদিন ঘোষ মহাশয়ের বড় ছেলেটি—যাহাকে আমি দাদা বলিয়া ডাকিতাম তিনি এক স্থানে প্রস্রাব করিলে আমিও আমার বালকবুদ্ধিবশতঃ সেইস্থানে প্রস্রাব করিয়াছিলাম।

তাহাতে ঘোষগিন্নী সেই প্রস্রাবের উপর আমার ঘাড় ধরিয়া মুখ ঘসিয়া দিয়াছিলেন—সেইখানে একখানা ইট ছিল তাহাতে আমার কপাল ফুটা হইয়া যথেষ্ট রক্ত পড়িয়াছিল। আজ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু কপালের দাগ্‌টা এখনও আমার সেই স্মৃতিটি জাগরিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাকে স্পর্শ করার জন্য তাঁহাকে স্নান করিতে হইয়াছিল। সে ভীষণ গোলামীর দুঃখের দিন যদিও এখন আমার নাই কিন্তু সেই দুঃখের দিনের কথাগুলি ভুলিতে পারি নাই। মা কাঁদিতে কাঁদিতে আমার সেবা করিতে-ছিলেন। অভয়ঘোষ সেই স্থান দিয়া গমন কালে মাকে বলিয়া-ছিলেন, "শূয়োরের পাল নিয়ে খাবেন আর ন্যাকামি! বেরো মাগী আমার বাড়া থেকে!" মা আমাকে কোলে করে ধানসিদ্ধ করিতে গেলেন। তাঁর চোখ মুখ বহিয়া জল আমার মুখে পড়িয়াছিল। সে সকল কথা আমার বেশ মনে পড়ে। সেদিন আমার ভাগ্যে পাতের ভাতও জুটে নাই। বেলা তৃতীয় প্রহরে এক থাল কড়কড়ে ঝণ্‌ঝণে ভাত, কোন কোন দিন বাসী অম্ল ভিজাভাত খোরাকীস্বরূপ পাইতেন। তাহাতে মনিবদিগের পাতের অবশিষ্ট তরকারী বিন্দুবৎ থাকিত। সেইদিন ভিজা-গন্ধ-এলান ভাত মনিবদের বাড়ী হইতে পাইয়াছিলেন। সেই ভাত মা, দিদি ও আমি বাড়ীতে বসিয়া খাইয়াছিলাম। রাত্রের খোরাকী বাবত দুই সের ধান দিতেন। সেই ধানগুলি আমাদের ঘরে ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসীতে থাকিত। বাড়ীতে কুটুম্ব আসিলে সেই ধানের চালের ভাত তাঁহাদিগকে আহারার্থ প্রদত্ত হইত। ঘোষগিন্নী

প্রায়ই বলিতেন—"ছোটলোকের মুখ আর শূয়োরের মুখ সমান —পচাপাচ্‌কো খেয়েই বেঁচে থাকে।"

আমরা আমাদের মনিবদিগকে পর ভাবিতাম না। তাঁহাদিগকে আমাদের আপনার বলিয়াই বোধ হইত। মাকে কখন তাঁহাদের উপর রাগ করিয়া কোন কথা বলিতে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মা আমাকে তাঁর মনিববাড়ী যাইতে বারণ করিতেন। আমি এক একদিন মায়ের কথা শুনিতাম, আমাদের পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতাম। মায়ের কথা মনে পড়িলেই, মায়ের মনিবদের বাড়ী যেতাম্‌। আমার পরণে তখনও কাপড় জুটে নাই, মধ্যে মধ্যে আমার মা তাঁর ছেঁড়া গামছাখানি পরাইয়া দিতেন। মনিববাড়ীর জলখাবার—মুড়ীর মধ্য হইতে কিছু মুড়ি, সেই ছেঁড়া গামছায় বাঁধিয়া আমার হাতে দিয়া—চলিয়া যাইতে বলিতেন। আমার মা, আমার দিদি না হইলে মনিবদের একদিনও চলিত না। তত্রাচ তাঁহারা আমার মাকে তিরস্কার করিতেন, গালি দিতেন, মধ্যে মধ্যে বাড়ী হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য শাসন করিতেন। আমরা যে ঘরে থাকিতাম, তাহা আমার পিতার নিজের হাতে তৈরি। বাড়ীর খাজনা বৎসরে আট আনা, মনিব মহাশয় মায়ের মাসিক আটআনা মাহিনা হইতেই কর্ত্তন করিয়া লইতেন। শরীর অসুস্থতা নিবন্ধন মনিব বাড়ীর কাজ কর্ম্ম করিতে না পারিলে মাহিনা কর্ত্তন হইত। দিদির অসুখ হইলে দিদির মাহিনা কাটা যাইত। মা দিদির অসুখের জন্য যাইতে না পারিলেও—আমার মায়ের মাহিনা কাটা যাইত।

আমার, দিদির ও মায়ের অসুখের জন্য যথেষ্ট মাহিনা কাটা পড়িত।

মায়ের মাসিক মাহিনা আট আনা ও দিদির মাহিনা দুই আনা ছিল। বৈশাখের ঝড়ে আমাদের ঘরের চালের খড় স্থানে স্থানে উড়িয়া গেল। বৃষ্টির সময় ঘরের মেঝেয় জল জমিতে আরম্ভ হইল। মায়ের হাতে পয়সা নাই। মনিববাড়ী হইতে বেতন চাহিলেও পাইতেছেন না। তাঁহারা বলেন হিসাব করিয়া তবে মাহিনা মিটাইয়া দিবেন—আমরা কিন্তু বৃষ্টির দিন "ঘর থাকিতে বাবুই ভিজার" মত ভিজিয়া যাই। বিছানা পত্রের মধ্যে একখানা তালপাতার ছেঁড়া তালাই, আর সহস্র তালি ন্যাকড়ার তাল পাকান একখানা কি দুই খানা ছেঁড়া কাঁথা ছিল। শীতকালে সেই ছেঁড়া কাঁথাই আমাদের লেপের কার্য্য করিত। গ্রীষ্মকালে তালাই ও ঘরের মেঝের মাটি আমাদের শয্যা ছিল। তাহাতে একদিনের জন্যও আমাদের যে কষ্ট হইয়াছিল—তাহা মনেই পড়ে না। আমরা বেশ সুখেই থাকিতাম। মাকে দেখিয়াই আমাদের সুখ ছিল। ক্রমে ঘরের উপরের খড়, ঝড়ে ও বাঁশের আন্দোলনজনিত আঘাতে উড়িয়া গেল, বৃষ্টির জল 'সবটুকু' আমাদের ঘরের মধ্যেই পড়িত। বৃষ্টি হইলেই আমরা তিন জনে ঘরের কোণে "জড়সড়" হইয়া ছেঁড়া কাঁথায় গা ঢাকিয়া বসিয়া থাকিতাম। মা আমাকে তাঁর কোলের মধ্যে টানিয়া লইতেন। এই রকমে বৈশাখ মাস কাটিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস দেখা দিল। মনিব মহাশয় এখনও মহিনার হিসাব করিয়া টাকা দেন নাই। আমাদের

ঘরের অবস্থা মনিব মহাশয় যে না দেখিয়াছেন তাহা নহে। আমাদের অসুখ হইলে মা যে দিন মনিব বাড়ী কাজ করিতে যাইতে পারিতেন না—সেইদিন মনিবগিন্নী আমাদের বাড়ী আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া মাকে ডাকিতেন, মা সেই ছিন্ন মলিন বস্ত্রখানি দ্বারা অতি কষ্টে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া বাহিরে বাহির হইতেন। ভাল কাপড়খানি আমাদের ব্যারাম হইলে আমাদের গাত্রাচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত হইত। সেই দিন তিনি বারবার মাকে ডাকিতে আসিতেন। কখন আদর করিয়া ডাকিতেন, কখন মিষ্টকথা বলিতেন, কখন তিরস্কার ও কটু কথায় আমাদের পাড়া কম্পিত করিয়া তুলিতেন। শেষে বলিতেন—"দাঁড়া, ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে দিচ্ছি!" মা আমাদিগকে ছেড়ে কিছুতেই যাইতেন না।

মনিব মহাশয় আমাদের সেই ভাঙ্গা ঘরখানি অনেকবার দেখিয়াছেন। তিনিও "ঘুঘুর বাসা" ভাঙ্গিয়া দিবার কথা বলিতেন। দিদি মাকে বলিতেন—মা, যদি সত্য সত্যই ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়—তাহা হইলে কোথায় দাঁড়াব মা?—মা সরলভাবেই বলিতেন—ঈশ্বর আছেন। আবার আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিতেন—মনিবরা যা বলেন—তা'কি করেন? এই যে তোমাদিগকে আমি ধম্‌কাই, তাই বলে কি কোলে নিই না? যাই হউক আর এ ঘরে বাস করা চলে না। বৃষ্টির দিন, রাত্রে ঘর হইতে ঝাঁপের পাশ দিয়া জল ছেঁচিয়া ফেলিতে হয়। ঘরখানি না ছাওয়াইলে আর চলে না! মা মনিব বাড়ীতে গিয়া মাহিনার

টাকার জন্য ধন্না দিলেন—মনিবগিন্নী মাকে বলিলেন—"কাজে কুঁড়ে, ভোজনে ডেড়ে।" মাগীর পয়সার তাগাদাই আছে, কাজের বেলায় মোটেই তাগাদা নেই

মাহিনার টাকা সে দিনও মিলিল না। আকাশে মেঘ করিয়াছে—বৃষ্টি হইবে রাত্রে কোথায় থাকিব! এই চিন্তাতে আমার মা অস্থির হইলেন। আমাদের পাড়ায় আমরা কয়েক ঘর আছি, সকলের অবস্থা প্রায় একরূপ। যাহাদের বাড়ীতে পুরুষ-মানুষ আছে তাহারা কোন উপায়ে ঘর মেরামত করিয়া লইতেছে। আমাদের সে ক্ষমতা নাই—আমি ছেলে মানুষ ঘর ছাইতে জানি না। আমাদের পাড়ায় একজনকে কাকা বলিয়া ডাকিতাম। আমার মনে পড়ে—সেই স্বজাতীয় কাকা কতকগুলি তালপাতা কাটিয়া আমাদের ঘরের জলপড়া নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং আমার মাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি খড়ের যোগাড় কর, বাঁশ দড়ি ঠিক কর, আমি তোমার ঘর ছাইয়া দিব।" খড়, বাঁশ, দড়ি চাই। টাকা কোথায় যে ঐ সব সংগ্রহ হইবে? কাকার নিকট মা অনেক কথা বলিলেন। কাকা বলিলেন—হারাধনকে কাহারো বাড়ী চাকর রাখ। মা বলিয়াছিলেন—হারু আমার ছেলে মানুষ চাকরী করিতে পারিবে কি?—আমি বুঝিলাম আমার কথাই হইতেছে—আমি চাকর থাকিব—বলিলাম। মা আমার মুখে চুম্বন করিয়া বলিলেন—পারবে বৈকি? একটু বড় হও! আমার দুঃখ তুমিই ত ঘুচাবে বাবা? আমার মনে আছে—আমার মায়ের চোখ সেই সময় জলে ভরে উঠে-

ছিল! আজ সে অনেকদিনের কথা! আজ আমি সেই হারু "ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান" হইয়াছি। আমার ওকালতীর খুব পশার হইয়াছে। আজ আমার সেই ভাঙ্গাঘরে তালপাতার গোঁজা আর নাই—দ্বিতল বাড়ী।

মায়ের মনিব বাড়ী আমি দাস হইলাম—আমার গোলামীর সেই আরম্ভ হইল। বৎসরে চারিটাকা মাহিনা হইয়াছে। আমার মা আমার মাহিনা ও দিদি ও মার মাহিনা পাইলেন। আমার মাহিনা অগ্রাম লইলেন। সেই টাকায় আমাদের কুঁড়ে ঘর খানি ছাওয়ান হইল। কাকা দুইদিন পরিশ্রম করিয়া, বাঁশ, বাকারী, দড়ী ও খড়ের যোগাড় করিয়া ঘরখানি বাসের উপযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আজ সেই কাকা আমার বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্তা। এখন আর আমরা ছোটলোক নই। আমাদিগকে স্পর্শ করিলে আর কেহ স্নান করেন না। পাছে ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইয়া যান এই ভয়ে আমরা আজও কাহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক স্পর্শ করি না। কিন্তু বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেতর ভদ্র ব্যক্তি আমাকে করমর্দ্দন পূর্ব্বক আলাপ আপ্যায়িত করিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করেন না। যাক্ আমার পতিত-জাতির সৌভাগ্যের কথা এখন বলিব না। আমাদের গোলামী যুগের কথায় যত আনন্দ যত শিক্ষা ও উন্নতির সৌভাগ্য আছে, বর্ত্তমান ভদ্র জীবনে আদৌ তাহা নাই। আমার বর্ত্তমান জীবনে, আমাদের শিক্ষার বিষয় কিছুই নাই বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমার বাল্য জীবনের দাসত্বের কথাই আমি এক্ষণে

বলিব। উহাই আমার প্রকৃত জীবনী। বর্ত্তমান জীবন সেই মহৎ জীবনের ছায়া মাত্র। প্রকৃত কায়া, প্রকৃত জীবনবৈচিত্র্য আমার দাস-জীবনেই ঘটিয়াছিল। আমি এখন আমার মনিবের ছয়টি গরু চরাই। আমি গোচারক রাখাল-জীবনে প্রবেশ করিয়াছি। মা আমাকে একখানি গামছা ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। রৌদ্র বৃষ্টিতে সেই খানি মাথায় দিয়া শরীর রক্ষা করি। মনিব-বাড়ীর গাই দোহন হইলে আমি পাঁচন বাড়ী হাতে লইয়া সেই নূতন গামছায় মুড়ি বাঁধিয়া মাঠে যাই। তৃতীয় প্রহরে মনিব-বাড়ী আসিয়া মনিবদের পাতের প্রসাদ পাই। আবার মাঠে যাই। মাঠে থাকি। সূর্য্যদেব যখন পশ্চিমগগনে লোহিত মূর্ত্তিতে অস্তগমন করেন, সেই সময়ে অপরাপর রাখালদের সহিত গরুর পালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা পল্লী মধ্যে প্রবেশ করি। গোহালে গরুগুলি বাঁধিয়া মনিব বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করি - আমার মাতা মনিব গিন্নীর নিকট হইতে তাঁহার স্নেহ পূর্ণ হাতের চেটো করিয়া একটু তেল চাহিয়া আমার মাথায় মুখে ও গাত্রে মাখাইয়া দেন। বাড়ী আসিয়া আমার মায়ের পাতের কড়্ কড়া ভাত দুটী দেবীর ভোগের মত তৃপ্তির সহিত আহার করি। মা কোলে করিয়া আমার পা টিপিয়া দেন। আমি ঘুমাইয়া পড়ি। আমাদের "ছোট লোকের পাড়ার" সকল ছেলেরাই পৃথক পৃথক মনিবের কেনা গোলাম। সকলেই সন্ধ্যার পর মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমায়। সেই পবিত্র ভক্তি ও প্রেমের যুগ বহিয়া গিয়াছে। সে স্বর্গীয় শান্তি বর্ত্তমান হৃদয়ে দুর্ল্লভ হইয়া গিয়াছে।

প্রাতে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ গোচারণে যাইতে হয়। আমার বাল্য সখা আটদশটি সকলেই মনিবদের কেনা গোলাম। গোলামী গ্রহণের দিন হইতে আমি ঘোষেদের রাখাল আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছি। আমি এখন ঘোষেদের রাখাল বলিয়া আমাদের সমাজে পরিচিত।

আমি ঘোষেদের রাখাল—কেনা গোলাম। খুব মনে পড়ে একদিন আমার পালের একটা দুষ্ট গাই—ঠিকমনে নাই, কাহার বীজ ধান্যের চারা দুই চারি খাবল খাইয়াছিল। যাহার বীজ তিনি ভদ্রলোক তিনি আমাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া কাণ ধরিয়া টানিতে টানিতে সেই মাঠ হইতে আমার মনিব মহাশয়ের নিকটে আনিয়াছিলেন। কাণের পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইয়া তাঁহার হস্তে রক্ত লাগিয়াছিল তিনি আমার গামছায় সেই রক্ত মুছিয়াছিলেন। মনিব মহাশয় আমার কার্য্যে অমনোযোগ দেখিয়া পায়ের চটী জুতা খুলিয়া ভীষণ প্রহার করিয়াছিলেন। জুতার আঘাত এতদূর গুরুতর হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আমার মাথা ফাটিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইল—আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া সেই উত্তপ্ত শোণিত মাতৃভূমির উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছিল—আমি ঠিক দেখিয়াছিলাম—আমারই রক্তে আমার দেহ ভিজিয়া গিয়াছিল।

মা আমার কাতর চীৎকার ও মনিব মহাশয়ের উচ্চ তিরস্কার রবে ও প্রহারের শব্দে মনিব বাড়ীর কাজ ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া কোলে করিয়া লইয়াছিলেন—আমি তখন অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম।

আমার যখন চেতনা হইল, তখন দেখি আমি আমার মাতার স্নেহের কোলে শুইয়া আছি। মনিব মহাশয় গাড়ুর জল আমার মাথায় ঢালিতেছেন। পাড়ার লোক জড় হইয়াছে। আমার ছোট-লোক স্বজাতীরাও আসিয়া মনিব মহাশয়কে দু চারি কথা শুনাই-তেছে। মাটী জলে ও রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। মা আমার মুখে জল দিলেন আমি সেই জল পান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলাম। মনিব মহাশয় রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন। পাড়ার লোকে ঘোষ মহাশয়কে ছি! ছি! করিতে লাগিল। মেয়েরা বলিতেছিল—'ছেলেটাকে খুন করে ফেল্লে গা' ? মাকে উদ্দেশ করিয়া কোন কোন আমাদের স্বজা-তীয়া ছোটলোকের স্ত্রীরা বলিতে আরম্ভ করিল—"তুই মাগী ছেলেকে রাখাল রাখিবার আর কি জায়গা পাস্‌নি ?" মা আমার চুপ করিয়া কাঁদিতে ছিলেন। আমাকে কোলে করিয়া সেই জল ও রক্তসিক্ত বসনে মা আমাদের বাড়ী গেলেন। সে দিন আমি গরু বাঁধি নাই, গরু আনি নাই। মা আমাকে ছাড়িয়া আর মনিব বাড়ী যান নাই। মনিবরাও কেহ আমাদের সে রাত্রিতে খোঁজ লন নাই। আজিও সেই মাথাফাটার স্থানটি কিছু উচ্চ হইয়া আছে। সেখানে চুল নাই। আজও আমি দর্পণে মুখ দেখিবার সময় সেই দাগ দেখিয়া গোলামী যুগের কথা স্মরণ করি। মনিবকে মনে পড়ে না, কিন্তু মাতৃস্নেহে আমার মনটা পূর্ণ হইয়া উঠে। আমি সংসারের সকল কথা ভুলিয়া কেবল মায়ের কথাই চিন্তা করি। আমার সেই স্নেহ-

ময়ী জননীর প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। সেই পবিত্র স্মৃতি আমার হৃদয়ে রক্ষা করিতে এখন একমাত্র কপালের দাগ ও মস্তকের কেশহীন অংশই বিদ্যমান রহিয়াছে। গোলামী যুগের সেই মধুময় স্মৃতিই আমাকে বর্ত্তমান কর্ম্মজীবনে সুপথ দেখাইয়া দিতেছে। সেই স্মৃতিই আমাকে বর্ত্তমান জীবনে উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। সেই পবিত্র পূর্ব্ব স্মৃতিই আমার স্বজাতীয় ছোট লোকদিগের উন্নতিকল্পে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেছে। জীবনসমুদ্রে সেই স্মৃতিই আমার ধ্রুবতারারূপে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেছে। ঐ স্মৃতির বলেই আমি ঘূর্ণয়মান সংসার-প্রবাহে জীবনতরী চালাইতে সমর্থ হইতেছি। ভগবান আমার গোলামী যুগের সৃষ্টি করিয়া আমাকে তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছেন। গোলামী দুঃখের হইলেও দুঃখের পরপারে লইয়া আসিয়াছে। দুঃখের বলেই সুখের স্বর্গে প্রবেশ অধিকার লাভ হইয়াছে। গোলামী ঘৃণ্য হইলেও মহৎ—একথা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি। কড়ায় গণ্ডায় উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি!

আমি আমার মাতার নিকট শুনিয়াছিলাম—আমাকে জুতাপেটা করিয়া আমার দেহস্পর্শজনিত অপরাধের জন্য মনিব মহাশয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শুচী হইয়া তবে মালাজপ দ্বারা ভগবানের নাম জপ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। আমরা পতিত জাতি, আমরা দাস বা গোলামের জাতি—আমরা কুকুর শৃগাল অপেক্ষাও

নীচ। আমরা অপবিত্র হীন জাতি। আমরাই তাঁহাদের গোলাম। দাসের জীবন বাড়ীর গরু বাছুর অপেক্ষাও হীন। গরু স্পর্শ করিয়া কেহ অশুচী হন না কিন্তু আমাদের ছায়া স্পর্শে তাঁহারা অপবিত্র হইয়া উঠেন। আমরা বাড়ীর কুকুরের সমান নিতান্ত হেয় জীব।

পর দিবস আমি মনিব বাড়ী যাইতে পারিলাম না। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম—প্রথম অপরাধের উপর আবার এই দ্বিতীয় অপরাধ করিলাম। অদ্য পুনশ্চ মনিবের কর্ম্মে অবহেলা করিলাম কিন্তু কি করিব প্রাতঃকালে আমার শরীরে এত বেদনা হইয়াছিল যে আমি শয্যা হইতে প্রথমে উঠিতেই পারি নাই। প্রথমে দিদি মনিব বাড়ী চলিয়া যাইবার পর মা আমাকে ভাত রাঁধিয়া খাইতে দিয়া তবে মনিব বাড়ীর উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। কাণ ও মাথায় বেদনা কয়েকদিন ছিল। আমি আমার মনিবকে কখন এই কর্ম্মের জন্য মনে মনেও অভিসম্পাত করি নাই। আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতাম কিনা তাহা মনে নাই—অভক্তিও যে কখন করি নাই তাহা মনে আছে। অধিকন্তু তাঁহাকে ভয় করিতাম। তিনি আমার নিকট জুজুর মত বোধ হইতেন। ভয়ে ভয়ে আমি তাঁহাদের কাজ কর্ম্ম করিতাম। ক্রমে আমার বন্ধুবর্গের মুখে শুনিতে পাইলাম—সকল রাখাল গোলামেরা আমার মত তাহাদের মনিবের নিকট অনেকবার মার খাইত। আমার জীবনে তাদৃশ মার আর কখন খাই নাই। ইহার পর হইতে আমার পালের

গরু আর কাহারও ক্ষেতে প্রবেশ করিয়াছে এ অপরাধের কথা আর কেহ কখন বলে নাই।

ছেলে বেলার কথাগুলি বিশেষ স্মরণ নাই। বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির কিয়দংশ মাত্র স্মরণ আছে। সেই সমুদয় কথা এবং আমার মা ও দিদির নিকট পরে যে সকল গল্পচ্ছলে শুনিয়াছি উহাই আমার বাল্যজীবনীর উপকরণ। সেই সকল উপকরণ অবলম্বনেই আমি আমার জীবনী লিখিতেছি। বাল্যজীবনের মধ্যে খেলা ধূলার কথা ত আদৌ মনে হয় না। যতদূর স্মরণ হয় চিরকালটাই খাটিতে খাটিতেই আমার জীবন চলিয়াছে। খেলার মত খেলা একদিনও খেলি নাই। গোলামীতে ভর্ত্তি হইয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত আমি খেলি নাই—তবে কর্ম্মের মধ্য দিয়া দৌড়াদৌড়ী করিয়া যদি কিছু খেলিয়া থাকি তাহা ঠিক বলিতে পারি না। মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে আমার বন্ধুগণ ক্রীড়া করিত। আমি মারের ভয়ে—লাথি গালি খাইবার ভয়ে সকলের পালের গরু দেখিতাম। এক এক দিন খেলিতে মন হইত কিন্তু মনিবের মার মনে পড়িয়া খেলায় বাধা দিত।

আমাদের "ছোট লোকের পাড়ায়" জন মজুরের সন্ধানে ভদ্রলোকেরা প্রায়ই আসিতেন। আমাদের পাড়াটা নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। ডোমপাড়া, বাগ্দীপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুচাপাড়া, চাষাপাড়া লইয়া আমাদের ছোট লোকের পাড়াটা, বলিতে কি গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক জুড়িয়াছিল। আমরাই "ভদ্রপাড়ার" সমুদয় কাজ করিয়া দিতাম। আমরা শূদ্র জাতি। আমরা হিন্দু

কিন্তু জাতিতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহা আমাদের সমাজিক জাতিত্ব। সমাজ হিসাবে আমরা হিন্দু জাতির গণ্ডীর বাহিরে। আমরা ছোট লোক—শূদ্র। আমাদের পাড়ার সকলেই নফর, গোলাম! যাহার লোক বল আছে তাহারা ঋণগ্রস্থ। অনেকে ভাগে দু দশ বিঘা চাষ করে। বয়ঃজ্যেষ্ঠগণ মনিবদের কৃষাণ। মোটের উপর আমাদের, ছোটলোকের পাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকেই ভদ্রলোকের দাস ও দাসীর কার্য্য করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। যদিও আমাদিগকে টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া লয় নাই তত্রাচ আমরা কেনা গোলাম! মাঠের চাষ, বাগানের কাজ, মোটবহা, বাড়ী ঘর প্রস্তুত করা, মাছধরা, চালকরা, কাটকাটা, পাল্কীবহা, ভারবহা, ভদ্রলোকের কুটুম্ববাড়ী যাওয়া, ভদ্রলোক মরিলে তাহাদের দাহার্থে কাঠবহা—বলিতে কি সংসারের সকল কাজই এই ছোটলোকের পাড়ার ছোটলোকরাই করিয়া থাকে। আমরা আমাদের মনিবদের কাজ না করিলে মনিবদের অন্ন জুটিবে না—ঘর ছাওয়া হইবে না—মড়া বাহির হইবে না—সূতিকাঘরের প্রসূতি বাঁচিবে না—মনীবদের ছেলে মানুষ হইবে না—কাপড় পরিষ্কার থাকিবে না। আমরা ছোটলোক তাই ভদ্রলোকদের রক্ষা। আমরা ভদ্রলোকদের উপর কথা বলিলে জুতা খাই। ভদ্রলোকের কথা না শুনিলে লাথি খাই। আমাদের টুঁ শব্দ করিবার যো নাই। ভদ্রলোকেরা আমাদিগকে কথায় কথায় তাঁহাদের স্ত্রীর ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। আমাদের সাধ্য কি এই সম্বোধনের জন্য ভগ্নীপতিকে

একটু রহস্য করি? আমাদের মধ্যে পরস্পর যদি বিবাদ হয় তাহা হইলে ভদ্র সম্প্রদায় আমাদিগকে ডাকিয়া আমাদের উভয় পক্ষেরই বিচার করেন—উভয় পক্ষের অর্থদণ্ড হয়। অধিকন্তু আমাদের ছোটলোকের কাণ আমরাই ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ঘোঁড়দৌড় করাই। আমাদের কাণ আমরা ধরিতে অনিচ্ছুক হইলে, জুতা আর লাথির ব্যবস্থা হয়। যে দিক্ দিয়াই দেখা যায় আমাদিগকে—এই শূদ্র-ছোটলোক গুলোকে পায়ের জুতার তলে রাখিবার ব্যবস্থাই ভদ্রেরা করিয়া থাকেন। আমরা কেনা গোলাম নই। আমাদিগকে কোন ভদ্রই গোলামাবাদ হইতে ক্রয় করিয়া আনয়ন করেন নাই। তত্রাচ তাঁহারা আমাদের মনিবের দল আমাদিগকে না ক্রয় করিয়াই কেনা গোলাম করিয়া রাখিয়াছেন। দাস প্রথা—দাস দাসী বিক্রয়—দাসদাসী বিক্রয়ের হাট, বাজার—কেনা গোলাম ও কেনা বাঁদীর প্রতি ভদ্র প্রভুদের ব্যবহারের কথা ইতিহাসে পড়িয়াছি কিন্তু আমাদের স্বাধীনপুরের বিনা ক্রয়ের গোলাম আমরা। আমরা কাহার ক্রীতদাস নহি তত্রাচ আমরা গোলাম—আমাদের ছোটলোকের পাড়াটা যেন গোলামাবাদ বা গোলামখানা। কোন দেশে বিনামূল্যের গোলামের কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা বিনা-মূল্যের কেনা গোলাম।

এই সকল কথা বাল্যকালে মনে হইত না। বুঝিতেই পারিতাম না আমাদের উপর এত জুলুম কেন?—মনে করিতাম আমাদিগকে এই রকমই করিতে হইবে। মনিব মহলের কাজ

করিতেই হইবে। মনিব বাপ্‌রে!—জুতার ভয়, লাথির ভয়, ধম্‌কানির ভয়, চোখ্‌রাঙ্গানীর ভয় এই সব ভয়েই আমি জড়সড় হইয়া থাকিতাম। আমি বুঝিতে পারিতাম আমার মত যতগুলি আমার স্বজাতি ছোটলোকের ছেলে ভদ্রলোকের রাখালি করিত সকলেই আমার মত মনিবের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া থাকিত। ভয়ে হৃদয় নিয়ত কম্পিত হইত। মনিবদের কথার অন্যথা করিতে সাহাস হইত না। আমাদের ছোটলোক ভগ্নীরা ছোট বয়স হইতেই মনিবের শাসনে—মনিব গৃহিণীর ঝাটারবাড়ী খেয়ে একেবারে অবসন্ন হইয়া থাকিত। ভদ্রলোকের গোলামী করিতে তাঁহাদের বাঁদীগিরী করিতেই আমাদের জন্ম এটা শিশুহৃদয়ে বজ্রলেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া যায়। আমরা যখন বড় হই তখন আকার ও বয়সে বড় হই; আমাদের হৃদয়স্থ বৃত্তিগুলি পূর্ব্বভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তি বাড়িতে পারে না। কেন উন্নত হয় না?—বালক বালিকা অবস্থায় আমরা সহস্র ঘটনার মধ্যদিয়া নীচতার, হীনতার ও গোলামীর চাপ পাইয়া ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হৃদয় হইয়া পড়ি। সেই মহান অনিষ্টকর শিক্ষা দীক্ষার পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক চাপে—ভদ্র সমাজের আওতায় আমাদের চিন্তাশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ হইয়াই থাকে। আমরা ভদ্রলোকের চাপের বেষ্টনীর বাহিরে ছট্‌কাইয়া পড়িতেই পারিনা। আমি বলিতে পারি আমি কখন মনিব গোষ্ঠীর অমঙ্গল কামনা করি নাই। প্রাণপণে হিতসাধনাই করিয়াছি কিন্তু তাঁহারা ভ্রমেও কখন আমাদের মঙ্গল বা উন্নতির কথা মনেও ভাবেন নাই।

আমরা এই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আপনাদের বিধিমত সেবা করিয়াই আসিতেছি। কই, কখন কি আপনারা আমাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন? সহস্র বৎসর গোলামী করিয়া, আপনাদের সেবা করিয়া আমরা আপনাদের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইলাম না। এই সহস্র বৎসর সেবার ফলে বুঝিলাম আমাদিগকে গোলাম ও আমাদের রমণীগণকে বাঁদী করিয়া রাখাই আপনাদের চরম উদ্দেশ্য! আপনাদের স্বার্থের জন্য সহস্র সহস্র ছোট লোককে পতিত, মূর্খ, অজ্ঞ করিয়াই আপনারা সুখী। সহস্র বৎসর ধরিয়া মনিব ভদ্র জাতির, শিক্ষিত বিজ্ঞ জাতির, সেবা করিয়াও যদি আমরা উন্নত হইতে না পারি, তাহা হইলে আর এই সেবার প্রয়োজন? স্বাধীন উড়িয়াজাতি ভারতের মধ্যে বীর, বিদ্বান ও শিল্পীজাতি ছিল, এই ষোড়শশতাব্দী হইতে তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়া এখন কি শোচনীয় হীন জাতিতেই না পরিণত হইয়াছে! হে ভদ্রবেশধারী ক্ষুদ্র প্রাণ মনিব—প্রভুর দল—আমি আপনাদিগকে করযোড়ে বলিতেছি—আমরা উড়িয়া-দের অবনতির বহু পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের সেবা ও গোলামী করিয়া আসিতেছি! আমরা এই হিসাবে কত ছোট হইয়া গিয়াছি ভাবিয়া দেখুন। তবু আমরা আপনাদের দক্ষিণ হস্ত।

আমরা আপনাদের সভ্যতা উন্নতির মূলীভূত কারণস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের গোলামী করিতেছি। আমরা আপনাদের সংসারের সকল কার্য্য করি বলিয়া আপনারা সময় পাইয়া শিক্ষিত ও জ্ঞানী হইতেছেন। তাই আপনারা সভ্য—আর

আমরা অধম, বর্ব্বর, ছোটলোক স্বার্থত্যাগী বলিয়া আপনাদের নিকটেই উপেক্ষিত হইতেছি। এই কি সেবার, এই কি গোলামীর চরম ফল ? আপনারা আমাদের প্রভু, মনিবজীবনের মালিক। আপনারা আমাদের হাত ধরিয়া তুলিয়া না লইলে, আর কাহার নিকট এ আশা করিব, কে আর তুলিয়া লইবে! আপনাদের সুখ ও শান্তির জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনাদের পান হইতে চূণ খসিয়া পড়িতে দিই না—তাই কি আমাদের প্রতি এতদূর বিজাতীয় ঘৃণা। আমরা ছাতা দিয়া মাথা রাখি, যে দিকে জল পড়ে, সেই দিকেই ছাতা ধরি, সেই পুণ্যের ফলেই কি আমরা ভিজিয়া মরি। আপনাদিগকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করি, তাই কি আমরা পিশাচ হইয়াছি। তাই কি আমরা পতিত হইয়াছি! আমরা জানি আপনারা আমাদের জ্যেষ্ঠ, সেই জন্যই কি আপনারা আমাদিগকে বর্ব্বর ভাবেন। তাই কি আমরা অস্পর্শীয় জাতি হইয়াছি! আপনারা কি আমাদিগকে শুচি করিয়া লইতে পারেন না? আপনাদের জন্যই আমরা নিত্যনৈমিত্তিক অশুচির কাজ করিয়া আপনাদিগকে শুচি করিয়া রাখিতেছি! সেই জন্যই কি আপনারা আমাদিগকে ঘৃণা করেন ? আপনাদের ঘৃণা হইবে বলিয়া, আপনাদের ঘৃণিত কাজগুলি আমরা না করি এবং ঘৃণা ও নিন্দার হস্ত হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া চলি। এই পাপের ফলেই কি আমাদিগকে পুরস্কার দেন—নিন্দায়! আমরা বহুকাল হইতে পুরুষপরম্পরায় আপনাদের গোলামী করিয়া কি একটুকুও আপনাদের জ্ঞানের অধিকারী

হইতে পারিব না! আপনারা কি "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরঃ" আমাদিগকে ভীষণ বলে চাপিয়া রাখিবেন? একটু দয়া, একটু স্নেহ, একটু করুণা করিয়া কি আপনারা আমাদের শিক্ষা, দীক্ষার উপায় করিয়া দিবেন না। একটু চেষ্টা করিয়া কি আপনারা আমাদের ছোট লোকের জাতিকে উন্নত করিবেন না? আমরা যে আপনাদেরই করুণার প্রত্যাশী হইয়া আপনাদের মুখের দিকেই তাকাইয়া আছি! কৈ দয়া ত হইতেছে না! দেশের সকল জাতিই এই নব যুগে উঠিতেছে! আমাদিগকে আপনারা কি উঠাইবেন না? আপনাদের যে আমরা গোলাম—ভৃত্যের জাতি। ভৃত্যের সুখ দুঃখের প্রতি কি আপনাদের দৃষ্টি পড়িবে না! আমরা আপনাদিগকে বিশ্বাস করি! বিশ্বাস করি বলিয়াই ত এত সুদীর্ঘ কাল আপনাদেরই মুখের দিকে তৃষিত নেত্রে তাকাইয়া আছি। এ ভীষণ তৃষ্ণা কি আপনারা নিবারণ করিবেন না! ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই পারেন!

আমরা কি যথাপূর্ব্বং তথাপরং রহিয়াই যাইব? আপনারা বাধ্য হইয়া সকল কর্ম্মঠ কাজগুলি আমাদেরই হাতে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিয়া, আমাদিগকে কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী জাতিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। বুঝিতে পারিতেছি, গোলামী করিয়া এইটীই আমাদের লাভ হইয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে কর্ম্মঠ করিবেন বলিয়া আপনারা একাজ করেন নাই! আপনাদের বিলাসবাসনা চরিতার্থের জন্যই, আপনারা আমাদের ঘাড়ে, নিজের বোঝাগুলি চাপাইয়া দিয়াছেন; কর্ম্মের ফলেই আমরা কর্ম্মী হইয়াছি। আপনারা আপনাদের কর্ম্মফলেই সংসারে বিলাসী ও

দুর্ব্বল জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছেন! আমাদের ছোট লোকগণের—গোলামজাতির বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। আমরা আমাদের সকল কাজই নিজে করিয়া লইতে শিক্ষা করিয়াছি। ঘর, দোর সকলি আমরা আমাদের নিজের হাতে করিতে পারি—চাষ-বাস সবই আমাদের হাতে। আপনারা আমাদের মনিব হইয়াও, আমাদের দাস হইয়া পড়িয়াছেন। পরোক্ষে আমরা আপনাদের গোলাম হইয়া মনিবের কার্য্য করিতেছি। চক্ষের চশ্‌মাটা একটু মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন বর্ত্তমানকালে আমরা আপনাদের নিকট কোন্ পদে উন্নীত হইয়াছি। আমরা নিরক্ষর জাতি, তত্রাচ বুঝিতেছি আপনাদের মনের অবস্থা কীদৃশ! আমাদিগকে নিরক্ষর, অজ্ঞান রাখিতে আপনাদের এতাদৃশ প্রয়াস ও আগ্রহ কেন? তাহা কি আমরা বুঝিতেছি না! লেখাপড়া শিক্ষা করিলে—আর এ দাস, এ পতিত জাতি, আপনাদের গোলামী করিবে না—এ মহাভ্রম আপনারা ত্যাগ করুন। শিক্ষার মত শিক্ষা দিতে পারিলে আমরা পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ জাতিই থাকিয়া যাইব। এখন যেমন আমরা আপনাদের কাজ করিতেছি, শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে তদপেক্ষা বেশী করিব বই কম করিব না।

আমার গোলামী আজ অনেকদিন হইল ঘুচিয়াছে। আমার ছোটলোক স্বজাতিগণ এখন শিক্ষালাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই এই জাগরণ আমার স্বজাতির মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দিয়াছে। আপনাদের পারি-

পার্শ্বিক চাপে আমরা নিষ্পেষিত হইতেছি। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আর চাপিয়া রাখা যাইবে না। মোস্‌লেম শাসন প্রভাবে আমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া মোসলমান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে মহৎ লোক হইয়া গিয়াছে। আপনাদের অনুগ্রহেই অনেকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। আমরা কেবল আপনাদের অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায় রহিয়াছি। আপনাদের গোলামী কে করিবে বলিয়াই সহস্র দুঃখের মধ্যেও আপনাদের পরিচর্য্যা ত্যাগ করি নাই কিন্তু সেবার ফল ত কিছু দেখিতেছি না! আমার ছোটলোক স্বজাতীয় বালকেরা মনিবের ছেলেদের পার্শ্বে বসিয়াই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে। মনিবের ছেলেদের মত লেখাপড়া শিখিতেছে। দুদিন পরে হয়ত তাহারাই মনিব হইবে; মনিবের বংশ তাহাদের গোলামীও করিবে

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমার বাল্য গোলামী-জীবনের পরিবর্ত্তন

আজ গোলামীর প্রথম হইতে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। এখনও আমি ঘোষেদের রাখাল। কেনা গোলাম। তখন আমার জ্ঞান একটু হইয়াছে। মনিবের ছেলেদের খাদ্য দেখিয়া আমার লোভ হইত। তাদের মত খাইতে পাইলেই আমি তখন জীবনে চরম সুখ বোধ করিতাম। মা মাঝে মাঝে, এক আধখানা লুচী ও সন্দেশের টুকরা আনিয়া আমাকে খাইতে দিতেন। মনে বড় আনন্দ হইত। আজ আর লুচি সন্দেশে সে আনন্দ নাই। লুচি খাই, বিবিধ মিষ্টান্ন খাই কিন্তু তেমন মিষ্ট লাগে না। রুচিও নাই। সেই আমি ঘোষেদের রাখাল হারু। কিন্তু সে হারু আর আমার মধ্যে নাই, আমার দেহ ছাড়িয়া বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে। পূজার সময় এক খানি নূতন কাপড় মনিব বাড়ী পাইতাম—তাহাও

হাঁটুর উপর পড়িত। চাদর জামার জন্য একদিন খোট করিয়াছিলাম, মা একখানা পুরাতন পরিষ্কার কাপড় ছিঁড়িয়া আমার চাদর করিয়া দিয়াছিলেন। মনিবের ছেলের একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। সেই জামা গায়ে দিয়া চাদর-খানা গলায় জড়াইয়া আমি পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম —তাহাতে যে আহ্লাদ হইয়াছিল, আজ শাল, দোশালা গায়ে দিয়াও সে-আনন্দ পাই না!

আমার পুঁজির মধ্যে একখানা কাপড়; একখানি গামছা আর একটা মনিব-বাড়ী হইতে প্রাপ্ত শেলাই করা ছেঁড়া জামা। জামাটা শীতের সময় গায়ে দিতাম। সেটা শীতের জামা নয়, তত্রাচ আমার পক্ষে সেইটাই শীতের জামা হইয়াছিল। এবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। আমাদের ছোটলোকের পাড়ার অনেকেই চিন্তিত হইয়াছে। অনেকেরই ঘরে ইতিমধ্যেই হাঁড়ী চড়ে না। দু বেলা আহার জুটে না! মনিববাড়ীতে আশঙ্কা হইয়াছে। ভিক্ষুকের দল দেখা দিয়াছে। স্বাধীনপুরে মজুরি মিলিতেছে না। অনেক মনিব দাস দাসীকে কর্ম্মে জবাব্ দিতেছেন। আমাদেরও জবাব হইয়াছে। ঘরে যে খোরাকির ধান ছিল—তাহার চাল করিয়া এক বেলা খাই, আর এক বেলা ভাতের ফেন খাই। গ্রামে মজুরিও মিলে না। উপায় কি? এতদিন মনিববাড়ী গোলামী করিয়া বেশ ছিলাম। গোলামীটা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এত দিনের পর, মাকে চিন্তিত হইতে দেখিলাম। আমাদের জন্যই মায়ের চিন্তা। গোলামী ছিল ভাল, জুতা, লাথি

খাইয়াও বেশ সুখে ছিলাম। এখন কি করিয়া খাইব, কি করিব এই চিন্তাতেই আমাদের ছোট লোকের পাড়াটা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনপুর ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে কাহার প্রবৃত্তি নাই। জন্ম হইতে যথায় লালিত পালিত হইয়াছি সহসা সেই সুপরিচিত প্রিয় ভূমির মমতা ত্যাগ করা সহজ নহে। আরও কিছু দিন জন্মভূমির মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিলাম। আমাদের মত, আমাদের ছোট লোকের পাড়ার অনেকেই থাকিল প্রথমে গ্রামের মধ্যে ভদ্রলোকের দ্বারে দ্বারে কর্ম্মের জন্য সকলেই ঘুরিলাম। তার পরে, পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগ্রামগুলিতে যাইয়া দেখি সে স্থানেরও ছোটলোকের পাড়ার দুর্দ্দশা আমাদের মত হইয়াছে। অনেক ভদ্রলোকের, আমাদের অপেক্ষা, ভীষণ কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের মত ক্ষুধা সহ্য করিতে পারেন না—তদুপরি লজ্জা ও মানের খাতিরে অপরের বাড়ীতে ভিক্ষাও করিতে পারেন না। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছিল।

আমাদের কর্ম্ম নাই—উপায় নাই—কোথাও গোলামী করিতে চাহিলেও, বিনা বেতনে কাজ করিতে চাহিলেও, কেহ গোলাম রাখিতে চাহিল না। আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কোন দিন কোথাও কাজ পাইয়াছিলাম—কোথাও যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য পাইয়াছিলাম। কোন গ্রামে কোন কোন ভদ্র দাতা কিছু কিছু করিয়া চা'ল বিতরণ করিতেছিলেন। ভিক্ষুকের দল—ক্ষুধিতের দলের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, তাঁহারা লুণ্ঠনের ভয়ে, দানকার্য্য বন্ধ করিয়া

দিলেন। আমরা দু দশদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের গ্রামে, নিজের ঘরে আসিলাম। পুরাতন মনিব-বাড়ী যাইলাম—তাঁহারা বলিলেন—আরও দুই মাস পরে আসিও, চাষের সময় তোমাদিগকেই রাখিব। এখন যে প্রকার দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছে—কি জানি আমাদের দশা কি হয়? বিনা বেতনে কর্ম্ম করিতে চাহিলাম, মনিব মহাশয় তাহাতেও রাজি হইলেন না; বরং বলিলেন—বেতন দিয়া কাজ করাইতে পারি কিন্তু 'পেট ভাতায়' কাজ করাইতে পারি না। মায়ের বেতন বাড়িয়া মাসিক বার আনা, দিদির বেতন চার আনা আর আমার বার্ষিক বেতন সাত টাকা হইয়াছিল সুতরাং এই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের তিন জনের খোরাক আদৌ চলিতে পারে না। আমরা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বাহির হইলাম—তখনও মনিববাড়ীর জন্য মমতা হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছিল। ঘোষগিন্নী, আমাদিগকে কিছু কিছু মুড়ি জলখাবার দিলেন। তিনিও যেন দুঃখিত। আমাদের উপর তাঁহার মায়া আছে বুঝিলাম। আমাদের গৃহের দ্বারে বসিয়া আমরা মুড়ি খাইতেছি—আমার মা একমুঠা মুড়ি চিবাইয়া খানিকটা জল খাইয়া মুড়িগুলি বাঁধিয়া রাখিলেন। মা বলিলেন তোরা বোস—আমি দুটা শাক তুলিয়া আনি—এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। এমন সময় আমাদের একজন ছোটলোক স্বজাতি আমাদের বাড়ী আসিলেন। এখন তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আমার বাড়ীতে তিনি থাকেন, তাঁহাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি,—এখন তিনিই আমার ছেলেদের ঠাকুরদাদা।

আমাদের বাড়ীর পার্শ্বেই তাঁহার ঘর ছিল—সেই ঘরে তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে বাস করিতেন। তিনিও আমাদের মত আমাদের গ্রামের ভদ্র মনিবের গোলামী করিতেন। তিনি যে বাড়ীতে গোলামী করিতেন, সেই বাটীর দুই মনিব যখন পৃথক হন, তখন বড় মনিবের অংশে তিনি পড়িয়াছিলেন। ছোট মনিব গোপনে তাঁহাকে তাঁহার চাকর থাকিতে পরামর্শ দেন। তাহাতে অস্বীকার করিলে—দিন কয়েক পরে ছোটমনিব মিথ্যা চুরি অপরাধে এই নির্দ্দোষ সাধুপ্রকৃতি দাসকে ভীষণ প্রহার করেন, ভদ্রবৈঠকে অর্থদণ্ড এবং অপমানের একশেষ করা হয়। তিনি মনের দুঃখে তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া হুগলী চলিয়া যান, তথায় চটের কলে কাজ করিয়া দু টাকা সংগ্রহ করিয়া তথায় চাষ বাস করিয়া দিন কাটাইতে ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি কিছুই ছিল না। তাঁহাকে আমি আরও দুই তিনবার আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখিয়াছিলাম। মায়ের নিকট শুনিয়াছি তিনি আমার পিতার খুড়তুতো ভাই। মা আসিয়াই জ্যাঠা মহাশয়কে দেখিয়া ক্রন্দন করিলেন। জ্যাঠা সকলি বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন—কাঁদিও না তোমাদিগকে লইতে আসিয়াছি চিন্তা কি ? মা তাঁহাকে গামছায় বাঁধা মুড়ী কয়টা জলযোগ করিতে দিলেন। এই প্রকারে কুটুম্বের প্রথমে মানরক্ষা হইল।

আমাদের মা, একটী কলসীপূর্ণ চাল—ঘরের মেঝের মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহা আমরা জানিতাম না। সেই চাউলপূর্ণ কলসী তুলিয়া মা ফেনে ভাতে রাঁধিলেন—বনের

শাক সিদ্ধ হইল। আমরা উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম।

পরদিন প্রাতে সেই চালগুলি ও ছেড়া কাঁথা, দুইখানি থাল. একটা ঘটি লইয়া একটী পুটলী হইল। আমি সেই ছেঁড়া জামাটি গায়ে দিলাম। ঘরে ভাল করিয়া ঝাঁপ দিয়া জ্যেঠার সহিত হুগলী রওনা হইলাম। প্রথমে আমরা পাদশাহী সরান ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। পথে আমাদের মত অনেক লোক চলিয়াছে। পশ্চিম দেশ হইতে অনেকে কলিকাতা অভিমুখে চলিয়াছে। সকলেরই মুখে অন্নকষ্টের কথা। আমার মত অনেক ছেলে গায়ে ছেঁড়া কাপড় জড়াইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লাঠির উপর ভর করিয়া চলিয়াছে--তাহারা দ্রুত চলিতে পারিতেছে না। আমার দিদির মত অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুটলী মাথায় করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের শরীর শীর্ণ—তাহারা পথ চলিতে পারিতেছে না। তাহাদের শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল। আমরা তাহাদের সকলের অপেক্ষা জোরে চলিতেছি, কিছু দূর চলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, তাহারা আমাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার এখন মনে হয় তাহারা কলিকাতা পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে নাই। পথের মধ্যেই কোথায় পড়িয়া মরিয়া গিয়া থাকিবে। দ্বিতীয় প্রহরে আমরা মেমারি ষ্টেশনের নিকট পৌছিলাম। তখনকার মেমারি ষ্টেশন এখন নাই। এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মেমারির বাহির হইতেই রোগা রোগা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকে ভরিয়া গিয়াছে দেখিয়া-

ছিলাম। বাগানের ধারে, তেঁতুল গাছে ঘেরা পুকুরের পাড়ে কয়েকটী মৃত-মানবের কঙ্কাল পড়িয়াছিল—চর্ম্মমাংসহীন নরমুণ্ডের ভীষণ দন্তপুংক্তি ও চক্ষুর গর্ত্ত দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল। সে কি বিকটমূর্ত্তিতে আমাদের দিকে চাহিয়াছিল! আহারাভাবে তাহারা মরিয়াছে? অল্পদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম বামদিকের চটিঘরের পার্শ্বে দুইটী শীর্ণ মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে একটী আমার মত বয়সের ছেলে—তার মা ও সে দুর্ভিক্ষে ক্ষুধায় মরিয়া গিয়াছে—কেবল চামড়া দিয়া তাহাদের হাড় কয়খানি ঢাকা রহিয়াছে। শৃগাল কুক্কুরে টানাটানি করিতেছে—তাহারা মাতাপুত্রে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে। তবুও তাহারা মৃত্যুর পর একত্রে রহিয়াছে। তাহাদের ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। ক্রমেই রোগা রোগা নরনারীতে মেমারি পূর্ণ দেখিলাম—দোকানের সম্মুখে তাহারা হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। কিছুই মিলিতেছে না। কেহ কেহ চলিতে গিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছে। সব যেন ভূতের রাজ্য হইয়াছে। ভূত প্রেতের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আমরা মেমারি ত্যাগ করিয়া অনেকদূর চলিয়া যাইলাম। ক্ষুধায় চাল ভিজাইয়া খাইয়া পথ চলিতেছি—অপরাহ্ণে বৈঁচী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে রেলের গাড়ী চড়িয়া হুগলী রওনা হইয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম রেলের গাড়ি চড়া।

আমি জীবনে এই প্রকার দুর্ভিক্ষ আর দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কিন্তু সেই মন্বন্তরের মত দুর্ভিক্ষ আর হয় নাই।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই আমার আনন্দ হইয়াছিল। মনিব-বাড়ীর কাজ গিয়াছিল কিন্তু মনিবগিন্নী ও মনিবের সহিত প্রায়ই হৃদয় মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হইত। মনিবদিগের কাজ করি না কিন্তু সম্পর্ক যেন ছুটেও ছোটেনি বলিয়া বোধ হইত। ভয় দূর হয় নাই। কাজ ছুটিয়া যাওয়াটা যেন অলীক মুখের কথার কথা, অন্তরে ত মনিবদের নিকট হইতে ছুটিতে পারি নাই? আমি পথে চলিতে চলিতে কতবার মনিবের কথা, মনিববাড়ীর কথা চিন্তা করিয়াছি। মনিবদের চিন্তা সহজে হৃদয় হইতে দূর হইবার নহে। তাঁহাদের প্রভুত্ব, শাসন, হৃদয়ের উপর ছাপ বসাইয়া দিয়াছে। ছাপ মুছিয়া ফেলিলেও পুনশ্চ ফুটিয়া উঠে। বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া যে বাহির হইয়াছি ইহাই আমাদের বাহাদুরী বলিতে হইবে। আজ কাল আমার মনে হয়—মনিব মহাশয়গণ আমাদিগকে জোর করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি করিয়া লইয়াছিলেন। আমরা স্বাধীন ছিলাম কিন্তু কৌশলে আমরা মনিবের গোলামের গোলাম হইয়া-ছিলাম। সে গোলামীর বাঁধন তাঁহারা বহুরূপে দিতেন। আমরা মূর্খ-সরল-ছোটলোক তাই মনিবদের বন্ধনে "অষ্টে পৃষ্ঠে লল্লাটে" বাঁধা পড়িতাম। আমার স্মরণ হয়, এক জনের ঠাকুর বাবা একজন মনিবের নিকট বারটী টাকা ধার লইয়াছিল—সেই টাকা কয়টীর জন্য তাঁহাকে জীবন-ব্যাপী মনিবদের গোলামী করিতে হইয়াছিল—তাঁহার পুত্র জীবন ভোর তাঁহাদেরই গোলামী করিয়া মরিয়া গিয়াছে এখন তার ছেলেটী সেই বাড়ীতে কাজ করিতেছে। এখনও মনিবদের পাওনা শোধ হয় নাই বা দয়া করিয়া মুক্তি দেন

নাই। আমাদের ছোট লোকদের কপালই ঐ রকম। লেখা পড়া না শেখার ফলে আমাদের এই দশা হইয়াছে। আমরা সাধ করিয়া গোলামীর দড়ি গলায় বাঁধিয়া লই। গোলামীর মায়া কাটান আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া গিয়াছে! আমি দিব্য চক্ষে যেন দেখিতে পাইতেছি—গোলামাবাদগুলিই বর্ত্তমান বিদ্যালয়—প্রকৃতই বলিতেছি—গোলাম তৈরি করিবার কারখানা 'স্কুল'। এই কারখানায় ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট বড় মধ্যম গোছের গোলাম তৈরি হইতেছে। আমার মনে হয় যখন স্কুলের ফটক দিয়া ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তাহারা বিদ্যাশিক্ষার জন্য দিব্যজ্ঞানার্জ্জনের জন্য যে বিদ্যালয়ে যাইত তাহা নহে—উহারা গোলামী শিক্ষার জন্যই অর্থব্যয়, সময় নষ্ট করিয়া ছুটিয়াছে। উহাদের পিতা মাতা কি নিষ্ঠুর! কি নির্দ্দয়!—ছেলেকে গোলামা-বাদে গোলামী শিক্ষার জন্যই পাঠাইতেছে। মানব এই গোলামা-বাদের কল্যাণে বর্ব্বরতাপূর্ণ গোলামী কায়দা কসরৎ শিখিয়া তোফা গোলাম হইয়া বাহির হইতেছে—গোলামীর পরীক্ষা আছে, ডিগ্রী আছে। ডিগ্রী লইয়া গোলাম হওয়া সৌভাগ্যই মনে করে। গোলাম পিতা পুত্রকে গোলাম করিতেই বাঞ্ছা করেন। সকলেই যে গোলাম হয় তাহা নহে?—যাঁহার প্রতিভা আছে তিনি গোলাম খানায় গিয়াও স্বাধীন প্রবৃত্তি বলে—গোলামী বেষ্টনীর সীমা ছাড়াইয়া মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করেন। এ প্রকার প্রতিভাবান্ ছাত্রের সংখ্যা অঙ্গুলি-পর্ব্বে নিশ্চয় করা যায়! আমি গোলাম, আমার চৌদ্দপুরুষ গোলাম

হইবে এ বাঞ্ছা অনেকেই করেন। স্বাধীন বুদ্ধি—ব্যবসায় বুদ্ধি সেই জন্য আমাদের মস্তিষ্ক হইতে কেবল কেন্দ্র মাত্র রাখিয়া চুপ্‌সাইয়া যাইতেছে। আমাদের মত নির্ব্বোধগুলাকে ঐ শিক্ষিত ওস্তাদ গোলামগণই—গোলামের গোলাম করিয়া রাখিতেছে।

আমি কিন্তু সেই বাল্যকাল হইতেই—ঘোষেদের রাখালী করিবার ফলে একটু একটু বুঝিয়াছিলাম আর কখন গোলাম-খানার সীমানায় পদার্পণ করিব না। জীবনে সাধ্যমত এই ভাব আজপর্য্যন্ত হৃদয়ে পোষণ করিয়াই রাখিয়াছি। গোলামী কি ভয়ানক জিনিষ! মানবকে পশু করিতে উহার মত ঔষধ আর নাই। আমাদের ভদ্রজাতিরা নিজেও গোলাম এবং অপর সকলকে গোলামী-বন্ধনে বাঁধিতে বিলক্ষণ পটু। সেই কারণে তাঁহাদিগকে দেখিলে ভয় হয় এবং বর্ত্তমানে দুঃখও হয়। অনেক তপস্যা অনেক সাধনা না করিলে এ গোলামী ভাবটা আমাদের মধ্য হইতে কিছুতেই লোপ পাইবে না।

আমি এখন হুগলী-সহরের বাহিরে একটী ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে জ্যেঠা মহাশয়ের পর্ণকুটীরে বাস করিতেছি। জ্যেঠার দশ বিঘা মাত্র জমি পুঁজি তাহাতেই জ্যেঠা ও জ্যেঠাইমার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়। তাঁহাদের ঘরগুলি সুন্দর পরিষ্কার—ঘরে দোর জানালা বসান, ঘরের মধ্যে চৌকি পাতা তাহার উপর বিছানা মশারি—এ সকল উপভোগ করা এ সকল ব্যবহার করা আমার শিক্ষা হয় নাই। প্রথম প্রথম ঘরে কপাট দিয়া শয়ন করিতে আমার কেমন কেমন বোধ হইত। মশারির মধ্যে শয়ন—

অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইত। চৌকি হইতে পড়িয়া যাইবার ভয় হইত! মশারির মধ্যে শয়ন করিতে ফাঁপর লাগিত। বালিশ মাথায় দেওয়াটা অভ্যাসই ছিল না। এখানে আমাকে বিস্তর শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমি মনে করিতাম আমার মনিবদের মত হইয়া গিয়াছি। মা ও দিদি জ্যেঠাইমার সহিত চট্‌কলে কাজ করিতে যাইতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে তাঁহারা আহার করিয়া কলে যাইতেন। কলের ভোঁ বাজিলেই তাঁহারা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। আমি জ্যেঠার সহিত থাকিতাম তিনি বাড়ীর চারিদিকের মাঠে কাজ করিতেন। সেই সকল জমি আমাদের—একথা তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। চাষের জমিত মনিবদের—সে জমি যে আবার আমাদের হয়, প্রথম প্রথম সে ধারণাই আমার হইত না! মনিবের জমি বলিয়াই মনে হইত। জ্যেঠা লাঙ্গল বাহিতেন, আমি তাঁহার কাছে লাঙ্গল বাহিতে শিখিতাম। জ্যেঠার বেগুন ক্ষেত, মূলার ক্ষেত, শাকের ক্ষেত, কুমড়ার ক্ষেত, সিম লাউয়ের মাচায় প্রচুর পরিমাণে লাউ ও শিম। আমি বেগুন নিড়াইতাম। লাউ, সিমের গাছের গোড়ায় জল দিতাম। পাইকারগণ আসিয়া যখন তরিতরকারী কিনিত আমি তখন শাকসব্জী তুলিয়া দিতাম। সিম তুলিতাম, কুমড়া তুলিতাম, লাউ মাচা হইতে পাড়িয়া আনিতাম। পাইকারগণ যখন উহার মূল্য দিত, তখন জ্যেঠামহাশয় হিসাব করিয়া লইয়া আমার হাতে টাকা পয়সা দিতেন এবং বলিতেন তোমার জ্যেঠাইমাকে দিও। আমি জ্যেঠাইমাকে আমাদের মনে করিতে

শিখিয়াছিলাম। ভাবিতাম এ টাকা পয়সা বুঝি মনিবদের। মাঝে মাঝে জ্যেঠাকে জিজ্ঞাসা করিতাম—জ্যেঠা এ টাকাকড়ি কা'দের ? তিনি হাসিয়া বলিতেন—আমাদের জমির ফসলের টাকা আমাদের ! আমি অবাক্ হইয়া যাইতাম। এ জমি মনিবদের নয় ! আমাদের, টাকা পয়সাও আমাদের। আমি পূর্ব্বে টাকা দেখিয়াছি কিন্তু হাতে করিয়া আমাদের টাকা এ চিন্তা মনেও করি নাই। জমি ও টাকা যে আমাদের হয় জ্যেঠার নিকট আসিয়া দেখিলাম। আমি ভাবিতাম দুনিয়াখানা মনিবদের। টাকাকড়ি, ধান, চাল, সন্দেশ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য মনিবদের। আমাদের কিছুই নয় ! এখন দেখিতেছি জমি, টাকা আমাদের হয়। ক্রমে ক্রমে মনে হইল, দুনিয়াখানা মনিবদের একার নয়—অনেকের। আমাদের ছোট লোকেদের যে জমি হয়, টাকা হয়, তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই। জ্যেঠার সহিত আমাদের মাঠে খাটি—আমাদের জমি—আমাদের গাছপালা—আমাদের টাকা—আমাদের ঘর। এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে মাস কয়েক কাটিয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম,—এ ঘরগুলি কি আমাদের, না মনিবদের জ্যেঠাই মা ? তিনি হাসিয়া বলিতেন—বোকাছেলে, এ যে আমাদের, আমাদের আবার মনিব কেরে ? আমি মনে মনে ভাবিতাম, তা হ'লে মনিবরা আমাদের "ঘুঘুর বাসা" ভেঙ্গে দিতে পারবে না ? আমাদের মনিব কেহ নাই ! কিন্তু মনিবের ভাবনা কিছুতেই ঘুচে নাই। মনিব নাই—আমাদের মনিব আমরাই !

এ এক অসম্ভব ব্যাপার ! গোলামী করিতে করিতে, মনের ধারণা, কেমন গোলামীর ভাবে বিভোর হইয়া যায়, তাহা বুঝিতেছি। এ ধারণা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া স্বাধীনভাবে আনা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহাও আমি হাড়ে হাড়ে, কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়াছি। আমি এখন আমাদের জমিতে কাজ করি, আমাদের গরু চরাই। আমাদের দুটা গাই আছে, তাহার দুধ খাই। আমি বাগানের ঘাস লইয়া গিয়া গাই দুটিকে দিই। এই রকমের কত ছোট খাট কাজ সমস্ত দিন ধরিয়া করি। মনের মধ্যে সাহস হইয়াছে। বেশ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—আমাদের জমি, আমাদের কলাবাগান, আমাদের ঘর—এ সকলই আমাদের, এ কি কম আনন্দের কথা। এই রকম আনন্দের মধ্যে আমি মৌমাছির মত খাটিতাম। আমাদের ক্ষেতের কোথায় কি হয়, সব শিখিয়া লইয়াছি। চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও আমি যেন দেখিতে পাই। কোদাল দিয়া জমি কোপাই, গাছের গোড়ায় মাটি দিই। সময়ে সময়ে জল দিই। আমাদের জমির ধারে একটা ছোট ডোবা ছিল, সেটাও আমাদের। জ্যেঠামহাশয় সেই ডোবাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। খেজুর-গাছের গুঁড়ি দিয়া ঘাট তৈরি করিয়াছেন—তাহাতে মাছও আছে। সেই জলে আমাদের স্নান হয়, বাড়ীর আর আর কাজ হয়। গঙ্গার জল খাই। বৈকালে জ্যেঠাইমা ও মা গঙ্গা হইতে খাবার জল লইয়া আসেন। দিদি একবেলা রাঁধেন।

একদিন জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—কাল তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি

করিয়া দিব। আমি এই ছয়মাস জ্যেঠামহাশয়ের নিকট প্রথম ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ ধরিয়াছি। আমার পড়া শুনায় আগ্রহ দেখিয়া, জ্যেঠামহাশয় আমাকে বিদ্যালয়ে দিবার জন্য, ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার কথায়, আমার ভারি আনন্দ হইয়াছিল। মনিবের ছেলে স্কুলে পড়িত—আমি আমাদের গ্রামের বিদ্যালয়টি দেখিয়াছিলাম। তখন এক এক বার পড়িবার কথা মনে হইত। কিন্তু মনিবদের ভয়ে সে চিন্তা মনোমধ্যে বেশীক্ষণ থাকিত না। এখন মনিবের ভয় নাই। আমাদের বাড়ী, আমাদের ঘর, আমাদের ক্ষেতং। সবই আমা-দের হইয়াছে দেখিয়া পড়িতে সাহস হইয়াছে। আমার কাপড় ও চাদর মা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কাল স্কুলে পড়িতে যাইব। এ এক অদ্ভুত আনন্দ! দিদি পরদিন পাটের কলে কাজ করিতে যান নাই। সকাল সকাল আহারাদি করিয়া জ্যেঠামহাশয়ের সহিত স্কুলে চলিলাম। বড় বড় দালান দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাইলাম।

যে কোন একটা যায়গায় ছেলেদিগকে গোলমাল করিতে দেখি—সেইটাই স্কুল বলিয়া মনে হয়। জ্যেঠামহাশয় যখন বলিলেন ঐ স্কুল—আমি আনন্দের সহিত সেই দিকে তাকাইয়া ছিলাম। আমার মনে ধারণা ছিল—আমাদের গ্রামের বিদ্যালয়টির মত বুঝি কিছু হইবে—দেখিলাম একটা বড় দালান বাড়ী—ধপ্ ধপ্ করিতেছে; নিকটে গিয়া দেখি—স্কুলবাড়ীর সম্মুখে ফুলের বাগান—কত ফুল ফুটে রহিয়াছে।

আমার মত, আমাপেক্ষা ছোট, বড় কত ছেলে খেলা করিতেছে, বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। স্কুলটি বেশ সুন্দর—ছাত্রও অনেক, তবে তারা স্কুলে আসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে কেন? খেলিতেছে কেন? এ স্কুলে কি পড়া হয় না? একি খেলাইবার স্কুল! মনে মনে কত চিন্তাই না হইয়াছিল। স্কুল গৃহে প্রবেশ করিলাম—ভয়ে ভঁয়ে চলিয়াছি—এত বড় ঘরে কি করিয়া পড়িব! জ্যেঠামহাশয় আমাকে একটি ঘরে লইয়া যাইলেন, সেখানে কত কি রহিয়াছে—কত পুস্তক কত ছবি! আমি কোথায় আসিয়াছি। স্কুল ত খুব একটা জমকাল জিনিষ বলে মনে ধারণা হ'ল—অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষপত্র দেখিয়া সে সকল কি অবগত হইবার বাসনা জাগরিত হইয়া উঠিল। জ্যেঠামহাশয় টাকা দিলেন এবং আমি ভর্ত্তি হইয়াছি বলিলেন। আমাকে লইয়া জ্যেঠামহাশয় আমার পড়িবার ঘর দেখাইয়া দিবার জন্য চলিলেন। ঠন্ ঠন্ করিয়া ঘণ্টা বাজিল। ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া যার যেখানে পড়িবার স্থান তাহারা সেই সেই ঘরে প্রবেশ করিল। স্কুলটি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণ খুব গোলমাল হইতেছিল ঘণ্টার শব্দের পর সব চুপ চাপ হইয়া গেল। জ্যেঠামহাশয় একটি ঘরে আমাকে লইয়া যাইলেন—তথায় যিনি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রণাম ও পদধূলি লইতে বলিলেন—আমি তাহাই করিলাম। জ্যেঠামহাশয় তাঁহার হাতে একখানা কাগজ দিলেন। শিক্ষকমহাশয় আমাকে বেঞ্চে বসিতে বলিলেন। আমি দেখিলাম আমার মত অনেক ছেলে সেই

শ্রেণীতে বসিয়া, পুস্তক খুলিয়া, মনে মনে পড়িতেছে। জ্যেঠা-মহাশয় বলিলেন,—ছুটির সময় আমি স্কুলের ফটকের ধারে থাকিব, তোমাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব। ভয় নাই বসিয়া থাক। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম ভয় আবার কিসের—আমাদের গ্রামে আমাদের ছোট লোকদের ছেলেদের সঙ্গে মাঠে মাঠে বনের ধারে গরু চরাইয়াছি—তাহাতে ভয় পাই নাই, এখানে অনেক রাখাল, ভয় কি ? আমিও মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। আজ আমি মনিবদের ছেলেদের মত স্কুলে পড়িতে বসিয়াছি। মনিবদের ছেলেদের মত কত ছেলে আমার গায়ে গা দিয়া বসিয়াছে। আমার দুই পার্শ্বে দুই জন মনিবদের ছেলেদের মত সাজিয়া গুজিয়া বসিয়াছিল—তাহারা বলিল—তুমি ভাই কোথা থেকে এলে—নাম কি ? আমি কোথা হইতে এলাম, এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইলাম না—আমি বলিলাম আমার নাম হারু। তাহারা আমার গায়ে অনেকবার হাত দিয়াছিল—আমি মনে মনে সঙ্কুচিত হইতেছিলাম কিন্তু তাহারা আমার সহিত বেশ মাখামাখি করিয়া বসিয়াছিল। উহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন কায়স্থ। তাহারা ত আমাকে ঘৃণা করিল না।

আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে আমি মোসলমান ছাত্র দেখিলাম। আমরা সকলেই গায়ে গায়ে বসিয়াছি। বালকদিগকে দেখিয়া আমার যথেষ্ট আনন্দ হইল। গরু চরাইবার সময় আট দশ জন রাখাল মিলিয়া গায়ে গা দিয়া বসিতাম। তাহারা আমার

মতই ছোট লোকের ছেলে! কিন্তু এখানে ভদ্রলোকের ছেলেরা, আমার মনিবের ছেলের অপেক্ষাও ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া, ভাল ভাল জুতা পায়ে দিয়া, আমার সহিত একই বেঞ্চে বসিয়া আছে! আমি মনে করিয়াছিলাম এ গ্রামের লোকগুলি বোধ হয় আমাদের স্বাধীনপুরের ভদ্র-লোক মনিবদের মত নয়? না হয় এ গ্রামের সকলেই আমার মত ছোট লোকের পাড়ার ছেলে হবে!—তাই যদি হবে তাহাহইলে আমার পার্শ্বে ব্রাহ্মণের ছেলে বসিয়া কেন? মনে মনে যতই এই সকল কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম, ততই যেন হুগলীর উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইতে আরম্ভ হইল। হুগলীর লোকগুলি খুব ভাল মানুষ—তারা ছোটলোকদিগকে ঘৃণা করে না।

ঠন্ ঠন্ করিয়া ঘণ্টা পড়িল; এর পূর্ব্বেই কয়েকবার ঘণ্টা বাজিয়া ছিল, বাজনা এত অধিক নয়। সমপাঠীরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি বুঝিলাম, স্কুলের ছুটী হইয়া গেল। এইত স্কুল বসিল, ইহারই মধ্যে ছুটী! তবে এখানে পড়া কি করিয়া হইবে? ছেলেরা খাবার খাইতেছে, কেহ খেলা করিতেছে। আমি ভাবিলাম এরা বোধ হয় বাড়ীতে কিছু আহার করিয়া আসে নাই। স্কুলে পড়িতে পড়িতে খেলার ছুটী হয় কেন? আমি পড়িতে আসিয়াছি, খেলিব না—আমি নিজের যায়গায় বসিয়া, পড়িতে লাগিলাম। সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটি বাহির হইয়া গিয়াছিল। সে যেন কাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঘরে প্রবেশ করিল। আমি পড়িতেছি—সে আসিয়া হাত

ধরিয়া বলিল—কিছু খাবে না,—আমি বলিলাম বাড়ী হইতে খাইয়া আসিয়াছি। ছেলেটি বলিল—আমিও খাইয়া আসিয়াছি—এ জল খাবার ছুটী—এই সময়ে আমরা কিছু জল খাবার খাই। আমি বলিলাম—আমার এ সময় খাইবার অভ্যাস নাই। আরে বিলক্ষণ —বলিয়া আমাকে টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া গেল। একজন লোক খাবার লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তাহার হাত হইতে কিছু খাবার লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিল—খাও! আমি ভাবিলাম যদি ছেলেটির বাড়ীর কর্ত্তারা বলে—মুরগীর পাল পুষিতে পারি না—ছেলেটি বলিল, ভাবছ কি? খাও? আমি বলিলাম—তোমার বাড়ীতে কিছু বলিবেনা ত? সে বলিল—কিছুই বলিবে না। কাল আমি মাকে বলিয়া তোমার জন্য আরও বেশী খাবার আনিব।—না একাজ করিও না—তাঁহারা রাগ করিবেন—আমরা ছোট লোক, দরিদ্র—আমাদের এ অভ্যাস ভাল নয়? আচ্ছা কাল বোঝা যাইবে? যে লোকটি খাবার আনিয়াছিল, তাহার কাপড় চোপড়গুলি পরিষ্কার, আমার মনিবদের মত ফিট ফাট্। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম ও লোকটি কে?—উত্তর হইল—ওটি আমাদের বাটীর ভৃত্য—ওর নাম রামচরণ, আমি 'রাম দাদা' বলিয়া ডাকি—নয় রাম দাদা? ভৃত্য রামচরণ বলিল —হাঁ দাদা! ভৃত্য! গোলাম! নফর! এ নাম গুলা গোলামের একচেটিয়া উপাধি। এ নাম শুনিলেই আমার ভয় হয়! সেই জুতাপেটার কথা মনে পড়ে! কিন্তু আমার মনিবের মত, এদের গোলাম দেখিতেছি—এদেশের সকলি আশ্চর্য্য! এদেশটা যদি

আমাদের স্বাধীনপুরে হইত, তাহা হইলে ভাল হইত। কে এদেশের লোকগুলিকে এ সব শিখাইয়াছে ? সে লোক যদি আমাদের স্বাধীনপুরে যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশের ছোট লোক গুলা বাঁচিয়া যায় !

আবার ঘণ্টা বাজিল, আমরা আমাদের পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিলাম। শিক্ষক আসিলেন। যিনি পূর্ব্বে পড়াইতে ছিলেন এবার তিনি এলেন না কেন ? এ পণ্ডিত নূতন দেখ্‌ছি ? পড়া শেষ হইল। ছুটীর ঘণ্টা বাজিল আমরা সকলে ঘর হইতে বাহির হইলাম। জ্যেঠামহাশয় ফটকের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি ডাকিলেন—হারু ? আমি তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পার্শ্বে যে দুইজন বসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আমাকে জল খাবার খাইতে দিয়াছিল—আর এক জনের সহিত কথা বলিয়াছিলাম। তাহারা আমার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, আমার জ্যেঠাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোন্ দিকে যাবেন ? জ্যেঠা মহাশয় বলিলেন—এই দিকে যাইব। ব্রাহ্মণের ছেলেটি বলিল কাল আপনি হারুকে লইয়া আসিবেন ? তিনি বলিলেন,—আসিব। তারা দুই জনেই বলিল—হারু ভাই ! আমরা এই দিকে যাইব। কাল দেখা হবে। তাহারা দুই জনে চলিয়া গেল—আমি জ্যেঠার সঙ্গে চলিলাম। জ্যেঠাকে তাহারা “আপনি” বলিয়াছে—একি কম আশ্চর্য্য—এ দেশের ছেলেরা পর্য্যন্ত ছোট লোকদিগকে ‘আপনি’ বলে ? এ ত কখন শুনি নাই ! জ্যেঠা খুব ভাল দেশে ঘর করিয়াছেন। এদেশে কি কেউ ছোট-লোক নাই ! এই রকম

ভাবিতেছি, এমন সময় জ্যেঠা বলিলেন—হারু তোমার জন্য নূতন পুস্তক কিনিয়াছি। শ্লেট, পেনসিল কিনিয়াছি, আর একটা ছাতা কিনিয়াছি। সেই নূতন বই, তোমাদের ক্লাসে পড়া হয়। নূতন পুস্তকের কথায় আমার ভারি আনন্দ হইল। কখন বাড়ী যাইব, কখন নূতন বই দেখিব, এই চিন্তাতে আকুল হইয়া উঠিলাম। জ্যেঠা কিছু দূরে গিয়া বলিলেন—আমাদের বাড়ী হইতে স্কুল অনেক দূর, তোমার কষ্ট হবে। এতদূর চলে আসা আবার বাড়ী যাওয়া কষ্ট হবে নয়? আমি বলিলাম—জ্যেঠামহাশয়? দেশে মনিবদের গরু নিয়ে নদীর ধারে যেতাম, সমস্ত দিন মাঠে মাঠে গরু চরাইতাম, আবার মনিববাড়ী আসিয়া, গরু বাঁধিয়া বাড়ী আসিতাম, তা'তে কষ্ট হয় নাই আর এই টুকু পথ আসিতে কি কষ্ট হয়? আমি আরও দূরে পড়িতে যাইতে পারি। বাড়ী আসিয়া নূতন পুস্তকগুলি লইয়া এক মনে দেখিতে লাগিলাম, বেশ পড়িতে পারিলাম কিন্তু এক খানি পুস্তকের ছবিগুলি সুন্দর দেখিলাম কিন্তু তার লেখাগুলি কিছুই বুঝিলাম না—মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, একি অদ্ভুত লেখাই লেখা রহিয়াছে। এ কি বই? এ বই পড়ে, না কি করে? জ্যেঠামহাশয় তামাক খাইতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—জ্যেঠামশাই এখানা কি বই? তিনি বলিলেন ওখানা ইংরাজী বই। এ বইখানা কি করিব? তিনি বলিলেন পড়িতে হইবে? আমি ভাবিলাম স্কুলেত এ রকম বই পড়া হয় নাই! তবে এ বই কেন? হাঁ জ্যেঠা-মশাই এ বইত আজ স্কুলে পড়া হয় নাই? তিনি বলিলেন—তুমি

যখন ঘরে গিয়া বসিলে, সেই সময়ে ত এই বই পড়ান হইতেছিল। তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই। কাল হইতে তোমাকে এই বই পড়িতে হইবে। আজ সন্ধ্যার সময় তোমাকে ইংরাজি বই পড়াইব। এখন একবার ক্ষেতে যাইব। আমি তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া জ্যেঠামহাশয়ের সহিত চলিলাম। কলা বাগানের মধ্যে গিয়া কাঁধি কয়েক কলা কাটা হইল, একটা কাঁধির কলা গোটা কয়েক পাকিয়াছিল। কলাগাছ কাটিয়া থোড় বাহির করা হইল। আমিও একটা কলা গাছ কাটিয়া থোড় বাহির করিলাম। ঝুড়িতে করিয়া এক এক কাঁধি কলা আমি বহিয়া বাড়ীতে আনিলাম। শেষে দুই জনে থোড় বহিয়া বাড়ী আনিলাম। জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—কাল ভোরে পাইকার আসিবে, তাহাকে কলা ও থোড় দিতে হইবে। জ্যেঠাইমা বলিলেন—হারুর জন্য এক কাঁদি কলা রাখিয়া দিব। জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—তাহা হইলে ঐ মর্ত্তমানের ছোট কাঁদিটা রাখিয়া দাও।

আমার গ্রামে, মনিববাড়ীর কলাবাগানে, দুই বৎসর ধরিয়া অনেক কলা হইয়াছিল। কাঁদি কাঁদি কলা মাথায় করিয়া বহিয়া বাগান হইতে বাড়ী আনিয়াছি। ছড়া ছড়া করিয়া কাটিয়াছি—মনিব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুণিতেন, শিরিশ পাতা দিয়া বড় জালার মধ্যে সাজাইয়া রাখিতাম। দিন কয়েক পরে কলাগুলো পাকিয়া শোন-ফুল হইয়া যাইত। তখন আবার বাহির করিতাম, মনিব মহাশয় গণিয়া ঝুড়ি ভরিয়া হাটে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন; ছোট ছোট দাগ ধরা কলা বাড়ীতে রাখিতেন। আমার সেই

পাকা কলা দেখিয়া অতিশয় লোভ হইত। ভয়ে কখন চাই নাই। মাঝে মাঝে আধপচা ছোট কলা দু একটা পাইতাম। এই রকম করিয়া মনিবের কলা কাটিয়া মাথায় করিয়া আনিয়াছি, একাধিক্রমে দুই তিন বৎসর এই কাজ করিয়াছি কিন্তু কখনও একছড়া কলাও পাই নাই। এ কলাবাগন আমাদের— আমি কলা বহিয়া আনিয়াছি, আমার জন্য জ্যেঠাইমা এক কাঁদি কলা রাখিলেন। মনিবদের কলা হইলে কি কখন দিত ? কেবল পুট্ পুট্ করিয়া চাহিয়া দেখিতাম। কলার গায়ে হাত বুলাইয়া, কলা খাইবার সাধ মিটাইয়াছি। আমাদের স্বাধীনপুরের মনিবরা যদি কখন আমাদের মত কলার গায়ে হাত বুলাইয়া—কলা খাইবার সাধ মিটাইত, তাহাহইলে বুঝিত ইহাতে কত কষ্ট হয় ? কেবল জুতালাথির ভয়ে, পাকা কলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াই চুপ করিয়া থাকিতাম। আমরা খাটিয়া খুটিয়া সব করিতাম। আমরা গোলামের জাত, গোলাম কিনা, তাই কলা দেখিয়া, কলা খাইবার সাধ মিটাইতাম। গোলাম মাত্রেই কলা দেখিয়া কলা খাইবার সাধ মিটায়। কলা খায় মনিবে ?

সন্ধ্যা হইলেই আমি ঘুমাইতাম। এ অভ্যাস শৈশব হইতেই হইয়াছে। অদ্য সেই দুষ্ট অভ্যাস, আমার নিকট হইতে চির-কালের জন্য বিদায় লইল। আমি আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসি-লাম। নূতন বাঙ্গালা পুস্তকের পড়া আমি পড়িলাম, পড়িতে কোন কষ্ট হইল না। বার কয়েক পড়িতেই মুখস্থ হইয়া গেল। জ্যেঠামহাশয় আমার নিকটেই বসিয়া ছিলেন। তিনি কোন

কথাই বলিলেন না—কেবল আমার পড়া শুনিয়াছিলেন। আমি বাঙ্গালা পড়া শেষ করিয়া ইংরাজি বই খানি খুলিলাম, ছবি দেখিয়া বইখানির সোজা ও উল্টাদিক নির্ণয় করিয়া লইলাম। জ্যেঠা-মহাশয় ইংরাজি বইখানি লইয়া বলিলেন—হারু ? তুমি 'ক' 'খ' পড়িয়া বানান করিতে শিখিয়া তবে ত পড়িতে পারিতেছ। এইবার তোমাকে ইংরাজী ক, খ, শিখাইয়া দিব। আমার মনে-হয় ইংরাজী পড়া সহজ। ইংরাজীর ক, খ, বাঙ্গালার মত নয়। এই দেখ ইংরাজীর ক, খ,--ইংরাজীতে ক, খ, বলিয়া কোন অক্ষর নাই। আমাদের ক, খর মত কতকগুলি অক্ষর আছে—সেগুলির উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন। এই বলিয়া আমাকে অক্ষরগুলি একে একে দেখাইয়া এ, বি, সি করিয়া অক্ষর পরিচয় শিক্ষা দিলেন। আমার খুব মনে পড়ে, আমাকে দুইবারের বেশী তিনি বলিয়া দেন নাই—আমারও অধিকবার শুনিবার প্রয়োজন হয় নাই। আমি এক মনে এক ধ্যানে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। জ্যেঠা-মহাশয় আমার মা ও জ্যেঠাইমাকে বলিলেন—হারু ইংরাজী অক্ষরগুলি শিখিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে শিখিতে পারিবে আমি তাহা ভাবি নাই। আমার অক্ষর শিক্ষার পরীক্ষা লইলেন আমি পাশ হইলাম। এসকল কথাগুলি আমার আজিও স্মরণ আছে। আমি সেই রাত্রেই আরও দুই পাতা পড়িতে পারিয়াছিলাম। জ্যেঠামহাশয়কে একবারের অধিক, আর আমাকে বলিয়া দিতে হয় নাই!

আমাদের বাড়ীর নিকটে একটা আমবাগান ও পুকুরের পর-

পারে, চটকলে যাহারা কাজ করিত, তাহাদের বাড়ী ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ চাষ আবাদ করিত না, চটকলে কাজ করিত, আর অবশিষ্ট মূল্যবান সময়টুকু আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াদিত। সন্ধ্যার পর যুবকগণ গান বাজনা করিত। আমার মত ছেলেরাও গান বাজনা করিত, তামাক খাইত। তাহারা চটের কলে কাজ করিত। আমার অপেক্ষা যারা ছোট ছিল, তাহারা কেবল সমস্ত দিন খেলিয়া বেড়াইত। তাদের পিতা মাতারাও কিছু বলিতেন না। আমাদের ছোটলোকদের লেখা পড়া শিক্ষার দিকে আদৌ নজর নাই। শিক্ষাটা তাহারা পছন্দ করে না, তাহা বলিতে পারি না। তাহাদিগকে কেহ বিত্থা শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করে না। ভদ্র লোকেরা যদি একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। আমরা ভদ্রলোকের মত সৌখীন, বাবু, বিলাসী হইতেই চাই—আমরা মনে করি ভদ্র হইতে হইলে —ঐ ভদ্রতার অঙ্গগুলিই অগ্রে করায়ত্ব করিতে হইবে—পোষাক পরিচ্ছদ, চুলকাটা, টেরিকাটা, সুগন্ধা দ্রব্যের ব্যবহার, তাস, পাশা, দাবা খেলা শিখিতে হইবে—এইগুলি বাঙ্গালী ভদ্রতার বিশিষ্ট অঙ্গ।

আমরা যে ছোট-লোক, তা আমরা বুঝি। আমাদের চাল চলন, হাব ভাবেই তাহা ধরা দেয়। আমরা গ্রাম হইতে ভিন্ন গ্রামে যাইতে হইলে—মাথায় তেল দিয়া টেরিকাটি, মুখেও একটু তেল মাখি। জামা গায়ে দিই—চাদরটা ভদ্রলোকের মত করিয়া কাঁধে ফেলি, ছাতা বা ছড়ি হাতে করি, জুতা পায়ে দিই।

আমরা আমাদের চক্ষে ও মনে ঠিক্ ভদ্রলোক সাজিয়া উঠি, কিন্তু আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, হাব, ভাব, চাল চলনে আমরা সামঞ্জস্য রাখিতে পারি না। ভদ্রলোকে, আমাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ঠিক্ চিনিয়া ফেলে! ভিতরে ভদ্রলোক না হইলে কি বাহিরে ভদ্রতা ফুটিয়া বাহির হয়? আমরা ভদ্রলোকের বিলাসিতাটাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করি—কিন্তু যে গুণের বলে, ভদ্রলোক ভদ্র হইয়াছে—সে গুণের সন্ধানই রাখি না! বাহিরের জাঁক জমকে ভদ্র হইলে, গাধাকেও পোষাক পরাইয়া ভদ্র করা যাইত! আমাদের স্বজাতি ছোটলোকগুলি, কেবল ভদ্রদের মত ফিট্ ফাট্ হইতে ইচ্ছা করে। সেই জন্যই ভদ্রলোকেরা আমাদিগকে দেখিয়া হাসে। যা কিছু উপার্জ্জন করি, ভদ্র সাজিতেই ফুরাইয়া যায়। ঘরে ভাল ডিট্জির লণ্ঠন আছে, ভাল ছাতা আছে, জুতাও আছে, চিরুণী আছে, আয়না আছে, ব্রুস আছে কিন্তু নাই থাল, গেলাস, নাই ভাল পরিষ্কার শয্যা, ঘরের চালে খড় নাই, বেড়ায় বাঁধন নাই। অপরিষ্কার ঘর, বসিবার বিছানা নাই, কেবল বাহিরে বাহার দিবার মত কিছু আছে—"বাহিরে কোঁচার পত্তন—ঘরেতে ছুঁচার কীর্ত্তন"। ঘরের মধ্যে ময়লা, আবর্জ্জনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আদৌ নাই। আমরা খাইতে জানি না—রাঁধিতে জানি না—খাদ্য দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার জানি না—কাহার পর কি খাইতে হয়, কেমন করিয়া বসিতে হয়, কেমন করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে হয়, তাহার কিছুই শিখি নাই। আমাদের ছোটলোকের দল, ভদ্র লোকদের বাবুগিরী দেখিয়া, দিন দিন কুড়ে হইয়া যাইতেছে—

আমরা মনে করি, কুড়েমিই বুঝি ভদ্রতার প্রধান লক্ষণ। কেবল হো হো করিয়া উচ্চহাসি হাসি। তাস খেলি, পাশা খেলি, দাবা খেলি, আর ভদ্রতার অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে উপার্জ্জিত অর্থ, জলের মত ব্যয় করিয়া, ফকির হইয়া পড়িতেছি।

সন্ধ্যার পর, আমাদের পাড়ার কয়েকজন লোক, আমাদের বাড়ী আসিতেন—তাহাদের সহিত জ্যেঠামহাশয় পূর্ব্বে কলে কাজ করিতেন। তাহারা জ্যেঠামহাশয়ের পূর্ব্ব বন্ধু। আমাদের বাড়ীর পিড়ায় বসিয়া—তাহারা তামাক খায় এবং জ্যেঠামহাশয় মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পড়েন তাহারা শুনে। একটু রাত্রি হইলেই বাড়ী যায়। ভোর চারিটার সময় উঠিয়া চটকলে কাজ করিতে যায়। তাহাদের আর চটের কলে কাজ করিয়া পোষাইতেছে না—পূর্ব্বাপেক্ষা খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণে সংসার অচল হইয়াছে—ইহাই তাহাদের ধারণা।

কি করিলে সংসার চলে, তাহার উপায় তাহারা পাইতেছে না। চটকলের টাকায়, আর সংসার চলে না। পূর্ব্বে চলিত, এখন আর চলে না। এখন চটকলের সাহেবরা, পূর্ব্বেকার সাহেবদের অপেক্ষা ভারি কড়া লোক, মায়া দয়া কিছুই নাই। চটকলে কাজ করিয়া, আর পোষাইতেছে না। জ্যেঠামহাশয় তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সমুদায় কথা মনে নাই—এখন সে সকল কথা জ্যেঠামহাশয়েরও মনে পড়ে না, নতুবা

জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিতাম—আমার যতদূর স্মরণ আছে তাহাই লিখিলাম।

জেঠামহাশয়ের বক্তৃতা

"আমাদিগকে চটকলেই কাজ করিতে হইবে, চটকলে কাজ করিবার জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত চটকলেই আমাদের অন্নসংস্থান হইবে। চটকলের সাহেব আমাদের জীবনে অন্নবস্ত্রের মালিক হইয়া বিদ্যমান আছেন; তাঁহারা হাসিলে আমরা হাসিব, তাঁহারা কাঁদিলে আমরা কাঁদিব, তাঁহারা উঠাইলে উঠিব, বসাইলে বসিব। এই কি এতদিনে আমরা চটকলে কাজ করিয়া শিখিলাম? আমরা কাহার জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটি—আমাদেরই জন্য? এ কথাটা আদৌ সত্য নহে। আমরা দেবতার ভোগ প্রস্তুত করি যত কিছু আমাদের দেশের মূল্যবান সার পদার্থ আছে সেই সকল দিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া, শরীরের রক্ত জল করিয়া পরমঅন্ন সুবর্ণ-থালে সাজাইয়া দিই! সেই দেবদুর্ল্লভ ভোগ সাজাই কাহার জন্য? ঐ চটকলের প্রভুদের জন্য! আমরা ক্ষুধায় জ্বলিয়া পেটে গামছা বাঁধিয়া প্রভুদের ভোগরাগের যোগাড় করিয়া দেই! ভোগের প্রসাদ পর্য্যন্ত দিবার নিয়ম নাই। থালাখানি পর্য্যন্ত না। আমরা তাঁহাদের অনুগ্রহে কলার চোকা, ডালিমের খোসা, আর আঙ্গুরের বোঁটাগুলি পাইয়া থাকি? তত্রাচ আমরা প্রভুদের উপর রাগ করি না, অকথা কুকথা বলি না। "তোমরা খাও চাল ডাল, আমরা খাই ভুসী" তত্রাচ তাহাতেই আমরা খুসী থাকি।

আমাদের পোষাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া চটকল প্রতিষ্ঠা করে নাই। আমাদিগকে পাকা কলা দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া, কলাটি খাইয়া, চোখাটি ছুড়িয়া দিবে—আমরা চাঁচিয়া, চাটিয়া, চিবাইয়া যতটুকু পারি ততটুকু রস কষ খাইব। তাহাতে তাদের ভ্রূক্ষেপ করিবার প্রয়োজন? তাহারা ত কলার চোখাটা অব্যবহার্য্য বোধেই ফেলিয়া দিয়াছে? যদি পার কলার চোখা খাইয়া খুসী থাক? তোমার পোষাণ না পোষাণর কথা ভাবিবার প্রয়োজন? তাহারা বোঝে শোষণ, পোষণের কথাটা কি কুলি-দের পক্ষে খাটে? আমাদের পোষায় বলিয়াই ত চাষের কাজ ছাড়িয়া চট্ করিয়া চটকলের কুলী হই! প্রভুদের বুলি শুনি। তোমার না পোষায় কুলীগিরী ছাড়িয়া দাও—এটা গোলামী হইলেও ঠিক গোলামী নয় তা বুঝি।

যেখানে কেনা গরু বাছুরের মত ব্যবহার পাইব, যেখানে আমি জীবনে ছুটী পাইব না, ইচ্ছা করিলেই কাজে ইস্তফা দিয়া স্বাধীনভাবে কোথাও যাইতে পারিব না। আমার ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তি যেখানে খাটাইতে আদৌ পারিব না—সেই রকমের যে কাজ সেইটাই—গোলামী। গোলামের মূল্য নাই! কিন্তু সখ্ করিয়া গোলাম হইলে চলিবে কেন?—কুলী—নগদামুটে কাহার কেনা-গোলাম নয়? বসা, ওঠা, খাওয়া, পরায় পূর্ণ স্বাধীনতা, অর্থসংগ্রহে, অর্থব্যয়ে প্রচুর স্বাধীনতা আছে—কেনা-গোলামের কিছুতেই নিজের অধিকার নাই!

চটকলের প্রভু কি বলিতেছেন—আমার চটকলেই কাজ কর?

তুমি ইচ্ছা করিয়া পাইখানায় পড়িয়া থাকিবে—তাহাতে কাহার কিছু যাইবে আসিবে না। যা কিছু যাইবে আসিবে তোমার! তুমি পাইখানা হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আর এক-জনের ঠিকায় মোট বহ। জমি চষ, মাথায় মোট করিয়া নানান্ জিনিষের ব্যবসা কর, তোমার কুলী তুমি হও—তোমার গোলাম তুমি হও! কেহ কিছুই বলিবে না—তোমারও লজ্জা নাই। যত কিছু লজ্জা পরের বোঝা বহিতে? বহিওনা—নিজের বোঝা নিজেই বহন কর। ঘরের ভাণ্ডার পরকে দিয়া ভিক্ষায় বাহি হইলে দোষ কি পরের হইবে! দোষ আমাদের নিজের।!

আর চটের কলে কাজ করিয়া পোষাইতেছে না? এই রকম কথা লইয়া ছোটলোকের মহলে খুব আন্দোলন হইতেছে। পোষায় ঠিক। পোষাইয়া যায় যদি বাবুগিরী ও বিলাসিতা ছাড়। কেন? যার পেটের ভাত জোটে না তাহার লম্বা কোঁচা, দামি দামি গায়ের পোষাক, কেন? পায়ে জুতা, কেন? চিরুণী, আর্শী, লণ্ঠন, ঘড়ি, এসব কেন—ঠেঁটিপর, চেটিতে বস—চেটাই বিছাইয়া শয়ন কর। বাজে অকেজো বিলাসদ্রব্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া লেপের ছারপোকার মত টিপিয়া টিপিয়া মারিয়া ফেল—দেখিবে পোষাইয়া গিয়াছে। যদি চটকলের গণ্ডী কিছুতেই ছাড়াইতে না পার—চটকলের কুলী হইয়া জমীদারের মত সাজসরঞ্জাম, চাল, চলন—এসবে কি লজ্জা হয় না! পাঁচ সিকার মাহিনা যার তার বেটার মাথায় সোণার টোপর? "পোঁটা বিলাসীর ব্যাটার না চন্দন বিলাস"! তুমি যেমন অবস্থার লোক সেই অবস্থাটার পরিচয়

তোমার সকল কার্য্যের উপর সকল ভাবের উপর ছিটিয়ে রাখ—দেখ্‌তে পাবে 'পোষাইয়া গিয়াছে'। পাকা চুলে কলপ দিয়া নব্যযুবক সাজিতে গিয়া আমাদের কপটতা জাহির করি। যা তাই হও। কপটতায় পোষাইবে না। ঠিক সাঁচ্চা হও, সাঁচ্চা থাক—যা তাই রাখ। নিজেকে ঠকাইতে গিয়া—পরকে অসত্যের দ্বারা ভুলাও! পোষাইবে না। পোষাইতে চাও ভিতর বাহির এক কাঁটায় কাঁটায় রাখিয়া দাও। নিশ্চয় পোষাইবে।

আর চটকলের কাজ ছাড়া কি দুনিয়ায় অন্নসংস্থানের উপায় নাই?

"তোমাকেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা"—চটকলের চাকরীটাই কি তোমাদের ভবসাগর পারাবারের একমাত্র তরণী না কি? চাকরীটার উপর এতাদৃশ মায়া বাড়িয়া গিয়াইত গোলামীর ঘুর্ণিপাকে পড়িয়াছ। বুকে সাহস করিয়া অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, ভাবিয়া ছিট্‌কাইয়া বাহিরে পড়। গোলামীর ভেল্কি ছুটিয়া যাইবে—তোমাদিগকে ভুলোয় পাইয়া বসিয়াছে—পরণের কাপড় ঝাড়িয়া পর! 'ভুলা' ছাড়িয়া যাইবে?

আমিও ত বিনা পুঁজিতে দেশথেকে এই হুগলীতে আসিয়াছিলাম। ঐ চটকলে আমরা মজুরী খাটিয়াছি। কিন্তু চটকলের নেশায় মাতিয়া যাই নাই। চটকলটার চাকরিটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি নাই। উহাই আমার জীবনের অবলম্বন হউক, এ বাসনা আমি কখনই করি নাই। চটকল হইতে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি—তাহাতেই আমি আত্ম-গঠন করিতে শিক্ষা করিয়াছি।

ওটা একটা দশজনে মিলে যৌথকারবার খুলিয়াছে ; ঐ কলের কর্ত্তা আমাদের মত চাকর। মালিকদের ঐ কাজে লাভ না দেখাতে পারিলে—যাকে আমরা মনিব বলিতেছি—ঐ কলের প্রধান চাকরেরও কাজ বজায় থাকিবে না। আমাদের দিকে, পাটের চাষার দিকে, পাটের মহাজনগণের দিকে তাকাইয়া তাহাদের পোষাইতে গিয়া কি কলটা মাটি করিবে ? ঐ টানাটানির উপরেই আমাদিগকে রাখিয়া দিবে। উহার ভিতর হইতে, ঐ টানাটানির ভিতর হইতে আধপেটা খাইয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া—পুরাপেটে খাইবার ভবিষ্য উপায় লইয়া চট্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। তুষানলে ধিকি ধিকি পুড়িয়া মরিতে কে চাহিবে বল ? তোমরা জীবনভোর পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে বলিয়া কলকে ধরিয়াই আছ। ধীরে ধীরে আয় অপেক্ষা নানান্ দিক দিয়া ব্যয়ের মাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছ। কিন্তু আর কোন রকম উপায়ের চিন্তাই কর নাই—উপায় করিবে কি করিয়া। ঐ চট-কলটা যেমন দশজন বৈদেশীকের দোকান—তথায় তাহারা লাভের উপর লাভ করিবে বলিয়া রাশীকৃত টাকা ঢালিয়া ব্যবসায় হাত দিয়াছে। আমাকে তদ্রূপ একা অল্পপুঁজিতে এমন একটা ব্যবসা খুলিতে হইবে—যাহা লইয়া ব্যবসা করিব তাহার দ্রব্যাদি একবারেই পরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া দোকান সাজাইব—জীবনের শক্তি-টুকু বুদ্ধিটুকু সেইখানে ঢালিয়া দিয়া কেবল উপার্জ্জন করিব, কাহার "এস্তাজারী" হইব না। পুঁজির জন্য দোকানের বিক্রেয় দ্রব্যাদির জন্য কখন মহাজনের দ্বারে যাইব না। আমার মহাজন আমি—

আমার বুদ্ধি আমার পরিশ্রম আমি ব্যবসায়ে ধার দিব—তাহারই সুদে—চক্রবৃদ্ধিহারে সুদে, আমি মাছের তেলে মাছ ভাজিয়া খাইব। তোমরা ত তাহা কর নাই? নিজের বুদ্ধি কিছুই ব্যয় কর নাই; নিজের শক্তিটুকু অপব্যয় করিয়াছ—উহার সহিত বুদ্ধি খেলাইতে পারিলে, তোমাদের পরিশ্রম সার্থক হইত। তোমরা তোমাদের পরিশ্রমটুকু দিয়াছ তাহার উপযুক্ত মূল্য পাইয়াছ। উহার সহিত যদি বুদ্ধিটী দিতে তাহা হইলে দ্বিগুণ লাভ হইত। আজ দেখিতে, আমার মত তোমাদের পোষাইয়া যাইত।

শক্তি চিরস্থায়ী নহে। জীবন যদ্রূপ চিরস্থায়ী নয়—মানবের শক্তি তদ্রূপ চিরস্থায়ী নয়। শক্তি দুদিন বা দশদিন পরে ফুরাইবেই ফুরাইবে। শক্তি দিনে দিনে হ্রাস হইবেই হইবে কিন্তু বুদ্ধি ফুরায় না যতই ব্যয় করিবে বিদ্যার মত বাড়িয়াই চলিবে। তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র শক্তির আদর বুঝিয়াছিলে, বুদ্ধির সমাদর করিতে শিখ নাই—বুদ্ধিতে তোমাদের মরিচা ধরিয়াছে, শক্তি তোমাদের ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে তাই এখন কুলাইতেছে না। এখন বুদ্ধির মরিচা ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিতে যে শক্তির প্রয়োজন সে টুকুও তোমাদের নাই, তাই তোমাদের পোষাইতেছে না। এখন যদি শক্তির দ্বারা বুদ্ধিটী মাজিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইলেও হইতে পার; এটা এখন তোমাদের নিকট অনিশ্চিত বোধ হইতেছে—কলের গোলামীতে শক্তি ক্ষয় তোমরা নিশ্চিৎ উপায় বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছ? তাহাই তোমাদের পোষাইতেছে না! দুটাকে

মিলিত ভাবে যদি কর্ম্মে লাগাইতে পারিতে, আজ তোমাদের পাঁচপোয়া পোষাইয়া যাইত। বুদ্ধিকে তোমরা ছোট মনে করিয়া ঠকিয়াছ। শক্তিকে বড় মনে করিয়া ঠকিয়াছ। তোমাদের ডবল ঠকা হইয়াছে। শক্তি তোমাদের মুক্তি দিতে পারিবেনা—একা বুদ্ধি বরং পারিত কিন্তু শক্তি তাহা আদৌ পারিবে না। আমি চটকল হইতে শক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা একত্রভাবে কর্ম্ম করিতে শিখিয়াছি। কলটা বড় কারখানা। আমি বড় নহি ক্ষুদ্র, তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও বুদ্ধিকে মিলিত করিয়া যে ক্ষুদ্র কারখানা খুলিয়াছি তাহাতেই জীবন সংগ্রামে টিকিয়া গিয়াছি। শক্তিকে বড় করিয়াছি বুদ্ধি দিয়া, বুদ্ধি বড় করিয়াছি শক্তি দিয়া সেই জন্য দুইটাই বাঁচিয়া গিয়াছে। দুটী শক্তির বলে আমি সংসারে অজেয় হইয়াছি। ডবল লাভ করিতেছি। বুদ্ধি ও শক্তি দুটায় ঘষাঘষি করিয়া নূতন শক্তি-বল লাভ করিয়াছি—তাই আমার পোষাইয়া গিয়াছে। বুদ্ধিই আমার শক্তির অপচয় হইতে দেয় নাই। ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। চটের কলটি উঠিয়া যাইলে তোমরা মরিবে—তোমাদের একা শক্তি তখন বুদ্ধি বিহনে নিস্পন্দ হইয়া যাইবে। একা শক্তি তোমাদিগকে কিছুতেই বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। এখন শক্তি আছে সময় থাকিতে থাকিতে শক্তি মন্দিরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া দাও। প্রকৃত কর্ত্তব্য পথ—শক্তি মন্দিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গুপ্ত কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইবে। এখন সময় আছে ক্ষীণ শক্তির সহিত ক্ষীণ-জ্ঞান প্রদীপের আলো জ্বালিয়া গন্তব্য পথ দেখিয়া লও—নতুবা

ঐ অগ্রে ভীষণ অন্ধকার তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে দেখিতেছ।—সেটা পূর্ণ অভাব—আগ বাড়াইয়া কোলে লইবে। অমানিশার অন্ধকারে, কাঁটার মধ্যে গর্ত্তে পড়িয়া কেবল হায় হতোস্মি করিবে মাত্র কিছুতেই উদ্ধার নাই।"

জ্যেঠামহাশয়ের বহু পুরাতন উপদেশপূর্ণ বক্তৃতাটি আমি আমার জীবনীর মধ্যে গ্রথিত করিয়া ছিলাম। জ্যেঠামহাশয়কেও আমি এই জীবনীর এই অংশটুকু পড়িয়া শুনাইয়াছি। এই বক্তৃতাটি আমি আজিও স্থূলভাবে মনে রাখিতে পারিয়াছি। আমি এই উপদেশে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। তাই আমি ঠকি নাই।

এই উপদেশের ফলে তাঁহার চটকলের পুরাতন বন্ধুবর্গের কোন উপকার হইয়াছিল কিনা আমার মনে নাই। কিন্তু আমার মহৎ উপকার হইয়াছিল, তাহা মনে আছে। আমার শক্তি আমি আমাদের কৃষিকার্য্যে দিতাম বুদ্ধি লেখাপড়ার দিকে ষোলআনা দিলেও বুদ্ধি চাষের কার্য্যেও আপনা আপনি কার্য্য করিত। আমি যখন এম, এ, পরীক্ষাদিই তখনও চাষের কাজে লাঙ্গল বাহিতাম। কৃষি আমার মুখ্য ও বিদ্যা অর্জ্জন আমার গৌণ কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইত। অদ্যাপি তাহাই আছে। সেই জন্য চাষ ও বিদ্যায় মিলিত হইয়া আমাকে 'জমিদার' আখ্যা দিয়াছে। বুদ্ধি ও শক্তি, চাষ ও বিদ্যা, একত্রে মিলাইতে না পারিলে আমি জমিদার হইতে পারিতাম না। সেই আমি ঘোষেদের রাখাল হারু—আজ এম্, এ; চাষা হারাধন রায় চৌধুরী।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যার্জ্জন ও কৃষি সমন্বয়ে কঠিন প্রয়াস

আমি বিদ্যালয়ে পড়ি চাষে খাটি এই রকমে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমার সমপাঠী ব্রাহ্মণের ছেলেটির নাম শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, কায়স্থ বালকটির নাম বিষ্ণুপদ বসু এই দুইজনের সহিত প্রথম পরিচয় হইলেও মহম্মদ খাঁর সহিত পরে যথেষ্ট আলাপ হইয়াছিল। ক্লাসের মধ্যে এই কয়জন ভালছেলে বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আমি সকলের প্রথম থাকিতাম, আমাকে কেহই কোন বিষয়ে পরাজয় করিতে পারিত না। বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছে; আমি প্রথম, শ্যামাপদ দ্বিতীয়, মহম্মদ খাঁ তৃতীয় ও বিষ্ণুপদ চতুর্থ হইয়াছি। আমরা এই চারিজনেই পুরস্কার পাইলাম। পুরস্কার বিতরণের দিবস শ্যামাপদের পিতা তারাপদ বাবু সভাপতি হইয়াছিলেন। হুগলীর অনেক গণ্য মান্য হিন্দু মোসলমান সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সকল বালক যুবা পুরস্কার পাইবে তাহাদের বাড়ীর অভি-ভাবকগণের মধ্যে অনেকেই আসিয়াছিলেন। আমার জ্যেঠা-

মহাশয়ও সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্যামাপদের পিতা সভায় দাঁড়াইয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সে দীর্ঘ বক্তৃতার অনেক কথাই আমার মনে নাই। মধ্যে মধ্যে খাপ্‌ছাড়া ভাবে যাহা মনে আছে তাহাই আমি গুছাইয়া লিখিলাম—*আমি যাহা লিখিলাম ঠিক এই কথা গুলিই যে তিনি বলিয়াছিলেন* তাহা নহে, তাঁহার কথা ইহার মধ্যে অবিকৃত ভাবে দু চারিটা থাকিতে পারে, অধিকাংশ তাঁহার ভাবাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

"আমিও একদিন তোমাদের মত বালক ছিলাম। আমিও এই বিদ্যালয়ে প্রথমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলাম। তোমাদের মত এই স্থানে পারিতোষিক লইবার জন্য আমিও একদিন সম-পাঠী ও বিদ্যালয়-বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়াছিলাম। সেই প্রাচীন বিদ্যালয় বন্ধুগণের মধ্যে অদ্যকার সভায় কতিপয় বন্ধু উপস্থিত হইয়াছেন। পুরাতন শিক্ষকগণের মধ্যে অদ্য একটি মাত্র শিক্ষক উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি ঐ সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি-তেছি। হে বালক ও যুবক ছাত্রগণ—তোমরা আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছ। সম্ভবতঃ আমি তোমাদের নিকট অপরিচিত নহি। তোমরা আমাকে ভাল বাস বলিয়াই—আমি তোমাদের নিকট পরিচিত হইয়াছি। আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব—তোমরা দেশকে উন্নত কর, তোমাদের দেশের জনগণকে উন্নত কর। আর তোমাদের পল্লীবাসী যে সকল জাতিকে নীচ জাতি, পতিত জাতি বলিয়া মনে

কর তাহাদিগকে আপনার প্রিয় জন বলিয়া, তাহাদের হাত ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া, উন্নত করিতে সমর্থ হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

আমি আমার প্রাচীন শিক্ষকমহাশয়কে প্রণাম করিয়াছি—তাহা তোমরা দেখিয়াছ? তিনি ব্রাহ্মণ নহেন—তিনি আমার পক্ষে ভগবান তুল্য শিক্ষাগুরু। তোমরা তোমাদের গুরুগণকে ভক্তি করিবে প্রণাম করিবে। যিনি গুরু তাঁহার সম্বন্ধে জাতি-বিচার ছাত্রের নাই, তিনি প্রণম্য। আমি আমার বাল্যজীবনে তাঁহার ছাত্র ছিলাম, এখন আছি। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ছুটিবার নয়? তোমরা বাণী মন্দিরে প্রথম প্রবেশ করিয়াছ। তোমরা মাতার প্রিয় পুত্র হইয়া, দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া স্বদেশের মঙ্গল বিধান দ্বারা উন্নত হও। আর জন্মভূমিকে সর্ব্ব রকমে উন্নত কর।

চেষ্টা করিলে কি না হয়? মানবের অসাধ্য কি আছে! তোমরা চেষ্টা কর উন্নত হইবে। এ কথা মনে রাখিও কঠোর পরিশ্রমে, কঠোর সাধনায় তবে সিদ্ধি লাভ হয়! সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিও বিলাসিতার ছায়া স্পর্শ করিও না! জগতের মানবমণ্ডলীর একমাত্র মূল অবনতির কারণ বিলাসিতা। আমার বোধ হয় বিলাসিতা বর্জ্জনই উন্নতির প্রধান সোপান। চরম উন্নতির সর্ব্বোচ্চ উপায় জীবনব্যাপি পরিশ্রম। তোমরা বিলাসিতা বর্জ্জন ও পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। পরিশ্রম ও বিলাসিতা বর্জ্জন দ্বারা মানবজাতির উন্নতি অনিবার্য্য। যে জাতি বিলাসিতা পরিত্যাগ ও পরিশ্রম করিয়া থাকে তাহারাই

জগতে আদর্শ জাতি মধ্যে গণ্য হয়। তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের পল্লীর, তোমাদের দেশের যে সকল অবনত জনকে 'ছোটলোক' বলিয়া লোকে হেয় জ্ঞান করে, তোমারা তাহাদিগকে পরম আত্মীয় ভাবিয়া শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা উন্নত করিবে। উহা-রাই কৃষক—উহারাই আমাদের জীবন। তাহাদিগকে উন্নত করিতে, শিক্ষিত করিতে না পারিলে আমরা কখনই উন্নত হইতে পারিব না। সেই সকল জাতি লইয়াই সমাজ। আমার এক অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে আমার জীবনটাই কর্ম্মহীন হইয়া যাইবে। সমাজের প্রধান অঙ্গ কৃষককুলকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অচল, অবশ করিয়া সমাজের উন্নতি অসম্ভব। সমাজ কখনই জীবন ধারণে সক্ষম হইবে না। অঙ্গহীন সমাজ সমাজই নহে। তাই বলিতেছি কৃষককুল ছোটলোক নহে! যদি সংসারে কেহ বড়লোক থাকে তবে কৃষক। আমরা সংসারের উদর—সংসারের হস্ত পদই কৃষক। কৃষকই মহৎ। সমাজের মাতা ও পিতা। শিশুসমাজ কৃষক অভাবে জীবিত রহিবে না। কৃষকই প্রকৃত সমাজহিতৈষী! কৃষক মহান্! কৃষি মহৎ। তোমরা কি অবগত নহ—এই চাল, ডাল, তরিতরকারী কোথা হইতে আসি-তেছে? কৃষকের কৃষিক্ষেত্র হইতে কি আসে না? কি ধান, কলাই কৃষকের অসীম পরিশ্রমলব্ধ ফল নয়! কৃষক না খাইয়া তোমাদিগকে আমাদিগকে খাওয়াইতেছে—কৃষক মাতাপিতার কার্য্য করিতেছে। সমাজকে কৃষকই রক্ষা করিতেছে। আমরা কৃষকের কল্যাণেই জীবিত রহিয়াছি। তত্রাচ কৃষককুলকে ছোট-

লোক ভাবি কেন?—কৃষি ছোট নহে মহৎ। যাহারা মহৎ কার্য্য করে তাহারাই মহৎ। ছোট লোকই মহৎ। কিন্তু তাহারা এতাদৃশ বিনয়ী ও নম্র যে আপনাদিকে ছোট ক্ষুদ্র নগণ্য বলিয়াই অবগত আছে।

"বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে"

আমরা বড় হইতে চাই—কিন্তু ছোট হইতে চাই না সুতরাং আমরা বড় কি না তাহাতে সন্দেহ করিতেছি। আমরা জোর করিয়া অহঙ্কারে, দম্ভের বলেই আমাদিগকে বড় বলিয়া ঘোষণা করি। আমরা বিনয়ী নহি, নম্র নহি, পরন্তু দাম্ভিক, উদ্ধত—সুতরাং আমরাই ছোট। যাহারা মহৎ কার্য্য করে অথচ আপনাকে অকিঞ্চিৎ বোধে আমাদিগকে মহৎ বলিয়া সম্মান করে তাহারা কি মহৎ নহে? যাহারা আপনাকে ছোট ভাবিয়া অপরকে মহতের আসনে বসাইয়া সম্মান ও পূজা করিতেছে—তাহারা প্রকৃত পথ ধরিয়া চলিয়াছে—তাহারাই মহৎ। আমরা বিপথে চলিয়া মহৎকে অপদার্থ ও হীনজ্ঞানে অনাদর করিতেছি। ছোটলোক বলিয়া তাহাদের সঙ্গলাভে আদৌ ইচ্ছা করি না। আমরা এক অপূর্ব্ব জীবে পরিণত হইয়াছি! আমরা স্বাস্থ্যকে অবহেলা করিয়া যেমন মৃত্যু লাভ করিতেছি। অন্নকে অবজ্ঞা করিয়া যেমন জীবনধারণ অসম্ভব, সেইরূপ কৃষককুলকে ছোটলোক অকেজো ভাবিয়া গোল্লায় যাইতেছি। যাহারা কাজের লোক তাহাদিগকেই অকেজো (Refuges) অবর্জ্জনা বলিয়া গৃহের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতেছি। তোমরা সাবধান হইও

কৃষক ও কৃষক বালককে সমাদর করিতে ভুলিও না। তোমাদের সমপাঠী কৃষক বালকগণকে ছোটলোকের ছেলে বলিয়া ঘৃণা করিও না। ভদ্র আখ্যা, সভ্য আখ্যাধারি অপেক্ষা ছোটলোক আখ্যাধারি কৃষক সংখ্যায় ও বহুগুণে অধিক। তাহারা আমা-দিগকে অপদার্থ, দাম্ভিক বলিয়া ঘৃণা করিলে আমরা এক দিনও বাঁচিতে পারিব না।

কৃষিই জীবন—তোমরা সকলেই কৃষির সমাদর ও কৃষকের সম্মান করিবে। কৃষি হইতে শিল্প বাণিজ্য হইয়া থাকে। সমাজকে উন্নত ও পুষ্টিবিধান কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারাই করা যায়। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য উন্নত হয় কি করিয়া তাহা কি তোমরা অবগত আছ? তোমরা স্কুলে আসিয়াছ বিদ্যাশিক্ষার জন্য—যদি প্রকৃত সত্য বিদ্যালাভে সমর্থ হও তাহা হইলে তোমাদের বিদ্যা-দ্বারা ও বহু দর্শন দ্বারা যে মহতী জ্ঞান লাভ হইবে তদ্দারাই দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য উন্নত হইবে। সেই কারণেই বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। এই বিদ্যালয় হইতে যে বিদ্যা লাভ করিবে তাহার সহিত যদি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক জ্ঞানগুলি তোমাদের শিশুপাঠের মত, সোপানের পর সোপান ক্রমে শিখিতে পার তাহা হইলেই তোমাদের প্রকৃত বিদ্যা-জ্ঞান লাভ হইবে। নচেৎ নহে। ক্ষুদ্র কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র বাণিজ্য জ্ঞানের মধ্য দিয়া তোমরা যদি তোমাদের জীবনকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠ্য-জীবন চালাইয়া লইয়া যাইতে পার তাহা হইলেই তোমরা সংসারের কর্ম্মীরূপে গড়িয়া উঠিবে। ব্যায়ামের জন্য

পৃথক্ অসামাজিক বিফল শ্রম দ্বারা শরীরকে পুষ্টি সাধনে আদৌ মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হইবে না। এমন ব্যায়াম অভ্যাস কর যাহাতে সংসারে চৌকোস হইয়া উঠিবে।

তোমাদের পাঠ্যজীবন—কৃষি শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা গঠিত হউক। বিদ্যালয়ের বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কৃষি, শিল্প দ্বারাই ব্যায়ামের কার্য্য করিয়া যাও। ইহাতে দুই দিকে লাভ আছে। ব্যায়াম ত হইবেই তৎ সঙ্গে সঙ্গে তুমি কর্ম্মঠ ও বহু দর্শনের ফলে বিজ্ঞ হইয়া উঠিবে। ভবিষ্য জীবনের জন্য তোমাদের চিন্তা হইবে না। তোমাদের সহস্র পথ মুক্ত হইয়া যাইবে। এই কার্য্যে অভিভাবকগণের সাহায্য ও চেষ্টা অত্যাবশ্যক কিন্তু তদপেক্ষা তোমাদের ইচ্ছা ও আগ্রহ সর্ব্বোচ্চ স্থানে, ইহা মনে রাখিও।

আমরা এতকাল বুঝিতে পারি নাই। এখন সে মহা ভুলটার সংশোধন আমাদিগকেই করিয়া লইতে হইবে। সে ভ্রমটা কি বুঝিয়াছ—কৃষিকে অবজ্ঞা। হে বালক ও যুবকগণ তোমরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় কৃষি-বিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জনে তৎপর হও। নিজ নিজ বাটীর সংলগ্ন ভূমিতে সংসারের উপযুক্ত নিত্য প্রয়োজনীয় ফুল, শাকশব্জী ও তরিতরকারীর ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া সহস্তে তাহাতে কৃষিকার্য্য কর। তোমাদের চেষ্টায় সংসারের একটা মহৎ অভাব মোচন হইবে—প্রচুর শিক্ষালাভ হইবে। ইহাই তোমাদের সর্ব্বপ্রথম কৃষিকার্য্য হউক। তোমরা ভবিষ্যতে বিজ্ঞ হইবে। ভ্রমণকালে তোমাদের ভ্রমণটাও যেন কার্য্যে লাগিয়া যায়, এই

উদ্দেশে আমি উপদেশ দিতেছি। নিকটবর্ত্তী কৃষকের কৃষিক্ষেত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তাহাদের নূতন ক্ষেত্র নির্ম্মাণপ্রণালী, চাষ, সার ও কৃষি উৎপন দ্রব্যাদির প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে কৃষিগুরু ভাবিয়া কৃষিসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবে। মনে রাখিও তাহাদের কৃষিক্ষেত্রগুলি বঙ্গের একমাত্র কৃষি পাঠশালা। আমার প্রতি তোমাদিগকে লক্ষ করিতে ও উপদেশ দিতেছি। আমার কৃষিক্ষেত্রে তোমরা গমন করিলে আমি সাধ্যমত তোমাদিগকে কৃষি বিষয়ক উপদেশ দিতে পশ্চাৎপদ হইব না। রবিবার, অপরাহ্নে সাধ্যমত তোমরা আমার বাগানে বেড়াইতে যাইবে।"

পারিতোষিক বিতরণ প্রাতঃকালে হইয়াছিল সভাভঙ্গ হইতে প্রায় বেলা দশটা হইয়াছিল। তারাপদ বাবু আমাদের সকলকে অপরাহ্নে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

আমি পারিতোষিকের পুস্তকগুলি লইয়া বাটী আসিলাম। জ্যেঠামহাশয় বাড়ীতে আসিয়া জ্যেঠাইমা, মা ও দিদিকে ডাকিয়া পুস্তকগুলি দেখাইয়া আমার অনেক সুখ্যাতি করিলেন। তারাপদ বাবুর প্রতি জ্যেঠামহাশয়ের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মাইয়াছে। তিনি সকলের নিকট তাঁহার সুখ্যাতি করিলেন। তারাপদ বাবুর বক্তৃতা তিনি বাটীর সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তারাপদ বাবুর সুখ্যাতি আজিও তাঁহার মুখে শুনিতে পাই। তারাপদ বাবু মানব কি দেবতা ?—নিশ্চয় মানবরূপী দেবতা। নতুবা তাঁহার মুখ দিয়া এই সকল কথা কদাচ বাহির হইত না।

আমি আমার মনিবমহাশয়ের কথা ভাবিলাম। আমার স্বাধীনপুরের কথা ভাবিলাম। আর ভাবিলাম—তারাপদ বাবুর মত লোক আমাদের স্বাধীনপুরে থাকিলে—স্বাধীনপুর স্বর্গপুর হইত। তারাপদ বাবুর বক্তৃতা যদি আমার স্বাধীনপুরের মনিব মহলের কেহ শুনিতেন তাহা হইলে বড় উপকার হইত। আমার স্বাধীনপুরের গোলাম মহলের চরম উপকার হইত। জ্যেঠামহাশয় বলিলেন হারু—তারাপদ বাবুর বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ আছে। আমি তাঁহার বাড়ীর বাহিরে কিছুদূরে দাঁড়াইয়া থাকিব তুমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আমার নিকট আসিবে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই হইবে।

আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা

আমি যথাসময়ে তারাপদ বাবুর বাড়ী গমন করিয়া দেখি বাহি-রের ফটকের ধারে আমাদের শ্যামাপদ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বিষ্ণুপদ তাহার হাতটী ধরিয়া আছে। জ্যেঠামহাশয় দূর হইতেই আমাকে শ্যামাপদর বাড়ীর ফটক দেখাইয়া দিয়াছিলেন। শ্যামাপদ আমাকে দেখিয়াই দৌড়িয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল। এখন আমি আর শ্যামাপদের হাত ধরিতে বা শ্যামাপদ আমার হাত ধরিলে কুণ্ঠিত হই না। আমার দুইটী বন্ধুই—কেবল এত দেরি, এত দেরি বলিয়া উঠিলেন শ্যামাপদ বলিল—ভাবিয়াছিলাম তুমি বুঝি আসিবে না! আমি কিন্তু ঠিক সময়ে গিয়াছিলাম এবং একটু অগ্রেই গিয়া-ছিলাম। তখন অনেকেই আ'সে নাই। শ্যামাপদ ও বিষ্ণুপদ আমাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। অতবড় দালান বাড়ীতে আমি কখন

প্রবেশ করি নাই। কত ঘর, কত আসবাব পত্র—সে সকলের নাম জানা দূরের কথা, আমি কখন চক্ষেও দেখি নাই। তাহার পর আমি দ্বিতলের উপরে উঠিলাম। দ্বিতলটী আরও সুন্দর। সে সৌন্দর্য্যের আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কত রকম ছবি, কত রকমের জিনিষপত্র দেখিলাম—সে সকল জিনিষের ব্যবহার কি, তাহা আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। কতক কতক দ্রব্যের ব্যবহার একরকম বুঝিলাম কিন্তু অধিকাংশ আসবাব্ পত্রের কোন ব্যবহার মানবজীবনে হইতে পারে কি না তাহা বুঝিলাম না—আমার মনে হইল ঐ সকল জিনিষের আদৌ ব্যবহার মানবজীবনে নাই। প্রায় গুটিকয়েক ছাড়া সকলগুলির নামও জানি না চক্ষেও কখন দেখি নাই। লোকজনও বড় কেহ নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম নিমন্ত্রণ হইয়াছে—একটা যজ্ঞীবাড়ী বলিয়া কথা—আমাদের মনিব বাড়ীর মত লোকজনে ভরিয়া থাকিবে—চিৎকার করিবে, কোথাও মাছের আঁইশ পড়িয়া মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করিবে। কোথাও তরকারীর খোসা রাশীকৃত পড়িয়া থাকিবে—স্ত্রীলোকেরা বঁটী লইয়া তরকারী কুটিবে—কত কথা বলিবে—ঝগড়া করিবে। গোপগণ দধি দুগ্ধের ওজন ও দরদাম লইয়া চীৎকার করিবে, ছেলেরা দলে দলে গোলযোগ করিবে। বৌয়েরা জটলা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে হাসিবে, গল্প করিবে, আর পান সাজিবে। মাছ ভাজা ও তরকারী রন্ধনের শব্দ হইবে। এটা নিয়া আইস—উহা কই—প্রভৃতি শব্দে কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইবে। আমাদের স্বাধীনপুরের মনিব বাড়ীর ভোজের মত

কোন আয়োজনই নাই। এটা যে যষ্ঠীবাড়ী—এখানে ভোজ ভাণ্ডারা হইবে—দেখিয়া তাহার কোন চিহ্নই পাইলাম না।

শ্যামাপদ একটী বড় ঘরের দ্বারদেশে গিয়া ডাকিল—মা? মা? গৃহের অভ্যন্তর হইতে একটী স্ত্রীলোক বাহির হইয়া বলিলেন—কেন শ্যামাপদ? শ্যামাপদ বলিল—এই আমাদের হারু এসেছে। আমি দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম—তিনি আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের মুখের নিকট হস্ত লইয়া হস্ত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন—বেঁচে থাক!

আমি অতিশয় কাতরস্বরে বলিলাম—মা আমি জাতিতে নমঃশূদ্র—আপনি আমাকে স্পর্শ করিলেন! তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন এমত সময়ে তারাপদ বাবু আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র শ্যামাপদ বলিল—বাবা এই হারু—হারুকে আপনি প্রথম পুরস্কার দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—যশস্বী হও? আমি তাঁহাকে হাতযোড় করিয়া বলিলাম আমি নমঃশূদ্র—আপনিও আমাকে স্পর্শ করিলেন? শ্যামাপদের মা তারাপদ বাবুকে কি বলিলেন—তারাপদ বাবু আমার হাত ধরিয়া সেই বড় ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। এ ঘরটীর মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত দ্রব্যে পরিপূর্ণ। একটা প্রকাণ্ড দর্পণ, সে রকম দর্পণ যে হইতে পারে সে ধারণা আমার তখন হয় নাই। সেই ঘরটীর মধ্যে যত জিনিষ আছে—তাহার ব্যবহার হইতেই পারে না বলিয়া আমার ধারণা হইল। আমি গৃহের চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। তারাপদ বাবু

বলিলেন—হারু তোমার মায়ের কাছে বস। আমি একবার বাহিরে যাই। তিনি চলিয়া গেলেন। শ্যামাপদের মা আমার হাত ধরিয়া একটা বিছানার ধারে বসাইয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন। তাহার পর আমার বাড়ী কোথায়, আমার কে কে আছে, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আমার স্বাধীনপুরের কথা হইতে সকল কথাই বলিলাম। তিনি আমার মায়ের মত আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সকল কথাই শুনিলেন। আমার কপাল ও মাথার দাগে হাত দিলেন। আমি অবাক্ হইয়া যাইলাম। আমি যে ছোটলোক, আমাকে স্পর্শ করিয়া ত ইহারা অশুচি হইলেন না। আমি যে ইহাঁদের বিছানাপত্র সব্ ছুঁইয়া ফেলিলাম্। আমি আবার বলিলাম—মা আমি নমঃশূদ্র আমাদের দেশে আমাদিগকে চাঁড়াল বলে—আমি আপনাদের বিছানাপত্র সকলি ছুঁইয়া ফেলিলাম। তিনি কোন উত্তরই দিলেন না। অধিকন্তু আমাকে কোলের নিকট লইয়া আদর করিলেন। বলিলেন—হারু তুমি লাঙ্গল চষিতে পার? আমি বলিলাম পারি মা? তবে দুষ্ট বলদ হইলে পারি না। তুমি আলুর চাষ জান? বলিলাম জানি মা। তোমাদের ক্ষেতে অনেক রকম তরি তরকারি হয়? তুমি সে সকলের চাষ জান? জানি মা। তাহার পরে তিনি বলিলেন—এস আমাদের ঘরকন্না দেখ হারু। আমরা চারিজনে এঘর হইতে ওঘরে, এ বারেণ্ডা হইতে ও বারেণ্ডা বেড়িয়ে দেখিতেছি, শ্যামাপদ, বিষ্ণুপদ সঙ্গে ছিল। বিষ্ণুপদ বলিল—হারু-ভাই কেমন দেখচ? আমি বলিলাম—যা দেখি নাই তাই দেখিলাম

ভাই? কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতেছে—এত জিনিষের কোনই প্রয়োজন নাই। অনর্থক জিনিষগুলা পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে।

তারাপদ বাবু ডাকিলেন—শ্যামাপদ! শ্যামাপদ বলিল আজ্ঞে! পুনশ্চ তিনি বলিলেন—হারুকে নিয়ে এস! শ্যামাপদের মা বলিলেন—উপরে ডাক! শ্যামাপদ বলিল—বাবা! মা ডাক্‌ছেন। তারাপদ বাবু আসিবামাত্র শ্যামাপদের মা বলিলেন—আমাদের হারু আমাদের একটা মস্ত ভুল ধরে ফেলেছে? তিনি বলিলেন কিসের ভুল? মা বলিলেন—আমাদের বাড়ীর জিনিষ-পত্র দেখাইতে দেখাইতে বিষ্ণু বলিল—হারু কেমন দেখ্‌ছ। হারু বলিল—যা দেখি নাই তাই দেখ্‌ছি কিন্তু এত জিনিষের কোন দরকারই নাই। অনর্থক জিনিষগুলা পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। তারাপদ বাবু আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—হারু চল আমাদের চাষের ক্ষেত দেখিবে চল। শ্যামাপদের মা বলিলেন—মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিও। আমি প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে। আমাদের সকলকে লইয়া তিনি বাগানে যাইলেন—অনেক রকম ফুলের গাছ দেখিলাম। বিবিধ শাকসব্জীর মধ্যে বহু অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল। নানানবিধ ফল—অবশ্য তরকারির জন্য ঐগুলি ব্যবহার হয়। মোটের উপর আমরা চাষাভূষায় যাহা কখন দেখি নাই তাহা দেখিলাম। আমি বুঝিলাম এ সকল দরকারী—বাড়ীর আসবাব-

পত্র অপেক্ষা মূল্যবান তাহার আর সন্দেহ নাই। একই রকম শাকসব্জী ও তরিতরকারী—কয়েক জাতীয় রহিয়াছে। একই জাতীয় ফুল—নানান্ রকম। আমি মনে করিলাম এইগুলি আমাদের চাষের ক্ষেত্রে সময় মত আবাদ করিব? ফুলগুলি অতি সুন্দর, অতি মনোহর কিন্তু অকারণ অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। অত অধিক সংখ্যক ফুলের গাছ না রাখিয়া শোভার জন্য কতকগুলি রাখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এমন কতকগুলি গাছ ঠিক করিয়া লইতে পারিলে যেন ভাল হয়—যাহাতে ফুলের বাহার, পাতার বাহার, ফলের বাহার আছে অথচ তদ্দারা উদরপূর্ণ করাও যাইতে পারে। অথবা বিক্রয় দ্বারা অর্থলাভও হইতে পারে। কেবল বাহারের জন্য আমাদের মত গরীব দুঃখীর ফুল-গাছের নিমিত্ত অতটা স্থান অকেজো অবস্থায় ফেলিয়া রাখা চলিতেই পারে না। বড়লোকদের সকলদিকেই অপব্যবহার। তাঁহারা যদি তাঁহাদের ছোট ছোট অপব্যবহারগুলি ধরিতে পারিতেন তাহা হইলে দুই দিন পরে বড় বড় অপব্যবহারগুলিও তাঁহাদের চখে পড়িত?

বাগানের মধ্যে একটী ছোটখাট ঘর আছে—তাহার মধ্যে বসিবার আসন আছে, ছোট বড় বোতলে নানান রকম বীজ সাজান আছে। প্রতি বোতলে বীজের নাম ও বপনের সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চাষের ছোট খাট সরঞ্জামগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজান আছে। একটী আলমারিতে কয়েক খানি পুস্তক ও আরও কত কি রহিয়াছে। পুষ্করিণী ও মাছ দেখিলাম। এই

সকল দেখিয়া পুনশ্চ তারাপদ বাবুর বাহিরের ঘরে আসিলাম। বিস্তর পুস্তক—কত রকমের পুস্তকে আলমারিগুলি বোঝাই রহিয়াছে। আমার পুস্তক গুলি দেখিয়া লোভ হইল। এই সকল পুস্তক পড়িতে পারিলে খুব্ লোখাপড়া শিক্ষা হইতে পারিবে। তারাপদ বাবু বলিলেন এই পুস্তকালয়েই আমার নৈশ বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ে প্রায় আশি জন ছাত্র প্রতিরাত্রে দুই ঘণ্টা পড়ে। তাহাদের বেতন নাই। আলোপর্য্যন্ত আমি দিয়া থাকি। সম্প্রতি একটী কৃষি-বিদ্যালয় খুলিয়াছি তাহাতে পাঁচটী ছাত্র আছে। ভবিষ্যতে নৈশ-বিদ্যালয়ের সহিত কৃষি-বিদ্যালয়ের সংযোগ সাধনের ইচ্ছা আছে। এই যে বাগানটা দেখিলে, ইহা আমার বাড়ীর বাগান, এ ছাড়া দুইশত বিঘার কৃষি-ক্ষেত্র আছে একদিন দেখাইব। সেই স্থানে ভবিষ্যতে এই কৃষি ও নৈশ বিদ্যালয় লইয়া যাইব।

আমরা সকলে একত্রে বসিয়া আহার করিলাম। কত প্রকার খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন হইয়াছিল তন্মধ্যে আমি জিলাপি, রসগোল্লা সন্দেশ ও লুচি চিনিতে পারিয়াছিলাম। অপরগুলির নাম জানি না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্যামাপদ ও বিষ্ণুপদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াই দেখি দূরে রাস্তার উপর আমার জ্যেঠা আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার সহিত তারাপদ বাবুর বাড়ীর কথা বলিতে বলিতে বাড়ী আসিলাম। পরদিন বিদ্যালয়ের ছুটী ছিল আমি প্রদীপ জ্বালিয়া পারিতোষিকের পুস্তকগুলি পড়িতে বসিলাম।

সন্ধ্যার পর আমাদের ছোট লোকদের পাড়ার চটের কলের কুলিদের স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেরা বেড়াইতে আসিয়াছে। জ্যেঠার নিকট আজকাল পাড়ার অনেকেই সন্ধ্যার পর আসিয়া থাকে। তাহারা সকলেই চটের কলে কাজ করে। আমাদের নিমন্ত্রণ তারাপদ বাবুর বাড়ীতে হইয়াছিল—এ সৌভাগ্যের কথা আর আমি বিদ্যালয় হইতে পারিতোষিক পাইয়াছি ইহা দেখিবার ও শুনিবার জন্য আসিয়াছে। আমি যে সকল পুস্তক পাইয়াছি সে-গুলি অতি সুন্দর নানান্ রঙের নানান্ ছবিতে পূর্ণ। আলোর চারিদিক বেষ্টন করিয়া স্ত্রীলোকেরা সেই বইগুলি দেখিতে লাগিল —ছেলেরাও দেখিল—আমার মত দুই তিনটী ছেলেও ছিল। ছবি দেখিয়া ছেলেদের মধ্যে সকলেরই পুস্তক লইবার ইচ্ছা হইয়াছে। তাহারা তাহাদের মাকে ঐ প্রকার পুস্তক ক্রয় করিয়া দিবার জন্য বলিল। জ্যেঠাইমা বলিলেন—তোমরা হারুর মত পড়, স্কুলে যাও, বই পাইবে। আমাকে স্কুলে যাইতে দেখিয়া অবধি আমাদের ছোট লোকের পাড়ার অনেকের সাধ হইয়াছিল —তাহাদের ছেলেরাও আমার মত পড়িতে যায়। জ্যেঠা-মহাশয়ের বন্ধুরা তাঁহাদের ছেলেদিগকে পড়াইবেন এ ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারাও আমার পুস্তকগুলি দেখিলেন। আমি আজ তারাপদ বাবুদের বাড়ী গিয়া কীদৃশ আদর পাইয়াছি, তারাপদর মা আমাকে কত আদর করিয়াছেন সমুদায় বলিলাম। আমি ছোট লোকের ছেলে হইলেও তাঁহারা আমাকে হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়াছিলেন। এই সকল কথা শুনিয়া সকলেরই

আনন্দ হইল। জ্যেঠামহাশয়কে বলিলেন—আমাদের ছেলেদের পড়াইবার একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। আমি বলিলাম পড়িলেই ত হইল? ইহার আর ব্যবস্থা কি?

আমি যখন সন্ধ্যা ও প্রাতে পড়িতে বসি তখন যাহার ইচ্ছা হয় সে ত পড়িতে পারে। অগ্রে প্রথমভাগ খানা পড়িয়া ফেলিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়। স্কুলে না যাইলে যে পড়া হইবে না—একথা কি কথা? পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে বাড়ীতেও পড়া যায়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন বলিলেন—হারু স্কুলে যায়, পড়ে বলিয়াই এই সকল সুন্দর বইগুলি বক্‌শিস পাইয়াছে। তারাপদ বাবুদের বাড়ীতে আদর পাইয়াছে, ব্রাহ্মণ হইয়াও তাঁহারা আমাদের হারুকে যত্ন করিয়াছেন, কত কি খাইতে দিয়াছেন। জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—হারু যে স্কুলে পড়ে বলিয়াই হারুর আদর হইয়াছে তাহা নহে। হারু স্কুলে পড়ে অথচ চাষার কাজ-গুলি ছাড়ে নাই এখন অবকাশ কালে লাঙ্গল বায়—বাগানে মাটি কোপায়—জমি নিড়ায়—ফসল বোনে—জল ছেঁচিয়া দেয়—সেই জন্যই হারুর আদর বাড়িয়াছে। চাষাভূষার ছেলেরা স্কুলে গিয়াই ভদ্রলোকদের ছেলেদের মত হইয়া যায়। তাহারা নিজে যে চাষার ছেলে তা জানাইতে কুণ্ঠাবোধ করে, তারা যেন ভদ্র লোকের ছেলে,—বাবুর ছেলে, সৌখিনের ছেলে এই ভাব দেখা-ইতে চায়। তারা এই প্রকার করে বলিয়া—আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া ফেলে। পূর্ব্বপুরুষগণের কঠোর পরিশ্রম ও বর্ত্তমান ছোট লোক সমাজের অধঃপতনের হেতুগুলি ভুলিয়া যায়। তারা

ভদ্রের সৌখিন ভাব লইয়া ভদ্র হইতে চায়। বাবু হইয়া উঠে। সেইজন্য তারা গোল্লায় যায়! তারা কেবল নিজেদের জাতি, নিজেদের অবস্থা কপটতাপূর্ব্বক গোপন করিয়া যেন ভদ্রের বংশাবতংশ ধনীর ছেলে এই ভাবটাই দেখাইতে ব্যস্ত হয়। নিজেদের দুরবস্থা—নিজেদের উন্নতি—নিজেদের অভাব চিন্তা করিতে মোটেই চায় না। নিয়ত সকল দিক্ দিয়াই তাহারা ভদ্র, বাবু ও সৎজাতি এই সকল দেখাইতে গিয়া নিজের অবস্থা ও স্বজাতিগণের উন্নতি করিতে ভুলিয়া যায় অথবা পারগ হয় না। আজ কাল দেশের অবস্থা উল্টাইয়া গিয়াছে। দেখিতেছ না। পল্লীগ্রামের সকল ভদ্রলোকেরাই চাষের কাজ করিতেছে। তাহারা কি চাষা নহে? তাহারা চাষা—আমরা চাষা নই প্রকৃত গোলাম। আমরা চাষারও গোলাম—ছোটলোক! চাষা, কৃষক, চাষী কথা গুলা গৌরবের হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্র চাষারা চাষের কাজ করে না তারা মাথায় ছাতা দিয়া—আমাদিগকে খাটায়। আমরা কেবল গরুর মত খাটি, গোহালে গিয়া ছানি খাইবার মত দু মুঠা ভুষী খাই।

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি
ঘরে বসে পুছে বাত
তার ঘরে হা ভাত?"

আমরা খাটি—এই হিসাবে যথেষ্ট লাভ হইবে কিন্তু তাহা

হয় না কেন ? কারণ আমাদের অবস্থা 'বলদের' মত খাটিতে হইবে ছানি ভুষী খাইতে পাইবে।

যখন বুড়া হইবে—চাষে খাটিতে পারিবে না—তখন বলদের আর আদর থাকিবে না। বাড়ীর আবর্জ্জনার মত ছ কড়া ন কড়ায়—কসাইদের হাতে বিক্রয় হইয়া যাইবে। যত দিন তাহাদের শরীরে বল ছিল—ততদিন তাহারা প্রভুর চাষে লাঙ্গল বহিয়াছে, গাড়ি টানিয়াছে, সার বহিয়াছে, ধান বহিয়াছে—যখন শেষ দশা তখন হতাদরে কসাই খানায় বলি হইয়াছে। জীবনের শেষে কোন কৃষককে দেখিয়াছ কি, যে তাহারা তাহাদের বলদ গুলিকে কাজ করিতে না পারিলেও বসাইয়া বসাইয়া খাইতে দিতেছে ? নিমক হারাম কৃষক নিমকহারামী করিয়া শেষে বলদ গুলাকে কসাইদের হাতে তুলিয়া দিতে কি কুণ্ঠিত হয় ? বিন্দু মাত্র নহে ! গাভী গুলি যত দিন বৎস্য প্রসব করিয়া দুধ দিবে ততদিন তাহাদের আদর থাকে। যখন দুধ দিবেনা—তখন এক দড়িতে বৃদ্ধ বলদের সহিত কসাইঘরে যাইবে। গুণের পুরস্কার —উপকারের প্রত্যুপকার কর্ম্মজীবনে ছানি ভুষীর সহিতই সম্পর্ক পাতাইয়া রাখে !

আমরা ছোটলোক গোলাম আমাদের অবস্থা বলদ ও গাভীর তুলনায় প্রায়ই সমান। যতদিন খাটিতে পারিব ততদিন ছানি ভুষীর মত দুষ্পাচ্য-কদর্য্য আহার দ্বারাই উদর পূর্ত্তি করিতে পাইব। গোয়াল ঘরের মত—মানব বাস অযোগ্য—গৃহেই বাস করিব। সোহাগের কর্ম্মী হইলে শীতের সময় একটা চট্ পাইব। শেষে

অক্ষম হইলে মনিব ভদ্র-প্রভুদের বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইব—অনাহার ও ভিক্ষুকস্বরূপ কসাই হাতে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করেন—কখন কি দেখিয়াছ ?—আমাদের ছোটলোকেরা জীবনব্যাপী খাটুনির পর মনিব মহাশয়-গণের নিকট শেষ জীবনের গোণা কয়টী দিনের জন্য কিছু সাহায্য পাইয়াছে ?—যদি দেখিয়া থাক তাহা খুবই কম।

আমরা খাটি পরের জন্য ! তাঁহারা কাঁদে ছাতি দিয়া যাহা লাভ করেন তাহা ষোল আনা। আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শরীরটী দীর্ঘকাল কর্ম্মঠ রাখিবার জন্য পুরাদমে খাটি না। খাটিতে পারি, যদি মনিব মহাশয়গণ ভবিষ্য জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইতে স্বীকৃত হন। সেই জন্য ছোটলোকদিগকে খাটাইয়া তাঁহারা অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা বাবু বিলাসী মনিব—চাষের কাজ একেবারে ঘৃণা করেন চাষাকে ঘৃণা করেন—তাঁরাই লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়া দেন। আমাদেরও তাঁহাদের নিকট খাটিয়া লাভ নাই। তাঁহারা শীঘ্রই চাষ ছাড়িতে বাধ্য হন। আমরা বিলক্ষণ জানি এ রকম—"ঘরে বসে পুছে বাত" মনিব গণের নিকট বেশী দিন চাকরী থাকিবে না। কাজেই মনিবদের প্রতি মমতা বাড়ে না—তাঁদের জমি জমার উপরেও "আমাদের" এই ভাব আসে না। কাজেই ফসল ভাল হয় না—চাষের উপযুক্ত ব্যয় অভাবে অপব্যয় বেশী হয়—তাঁহারাই চাষের কার্য্যে খাম্-খেয়ালী বেশী করেন।

যেখানে যে খরচ করা আবশ্যক সেখানে কিছুই না করিয়া

অজ্ঞতা ও খামখেয়ালী বশতঃ যেখানে কিছুই ব্যয় করা উচিত নহে তথায় যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া—ফৌত হইয়া পড়েন। যে জমিতে ভাল ধান হইবে সেখানে কলার চাষ, যেখানে হলুদ হইবে সেখানে আখের চাষ করেন। সেই কারণে "তার ঘরে হা ভাত।" আজি কালিকার দিনে চাষের কার্য্য করা ভদ্রলোকদের মধ্যে একটা 'ফ্যাসান' হইয়াছে। যাঁহারা কখন চাষের সীমানায় পা দেন নাই, জীবনে যাঁহারা কৃষি বা কৃষকের সহিত পরিচিত নহেন —তাঁহারা খেয়ালের বসে—বাহবার জন্য—চাষে নামেন। জলে সাঁতার দিতে না জানিয়া—জলে সাঁতার দিতে যাইলে মানবের যে দশা হয়, এই দলের সৌখিন বাবুর চাষা হইতে ইচ্ছায় তাহাই হয়। সফলতার মুখ ত দেখিতেই পান না, বিফলতার যাতনা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ধরে। তাহারাই এদেশের কৃষিক্ষেত্র, কৃষক ও কৃষি ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া দেশের ইষ্ট অপেক্ষা প্রভূত অনিষ্ট করিয়া বসেন।

দেখ—হারু যে স্কুলে পড়ে বলিয়া নয়? ছোটলোকের ছেলে—বড় একটা ভদ্রতা বাহিরে দেখাইবে না কৃষি প্রভৃতি তাহাদের জাতীয় ব্যবসাগুলি ধরিয়া উহার উন্নতি বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজ নিজ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া যদি স্কুলে লেখাপড়া শিখে তবেই সাচ্চা ভদ্রলোকের নিকট তাহাদের আদর থাকে। বিদ্যাশিক্ষা গোলামীর জন্য নহে—দেশের উন্নতি ও মঙ্গলবিধানের জন্য। তোমরা যদি তোমাদের ছেলেদিকে স্কুলে বা বাড়ীতেই পড়িতে দাও তাহা হইলে তাহাদিগকে

ভদ্র-বাবু-সৌখিন বা চাক্‌রে গোলাম করিবার জন্য শিক্ষাদিলে—কখন আদর পাইবে না। তাহাদিগকে আমাদের ছোট-লোক স্বজাতীর কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিতেই হইবে—যাহাতে সৌখিন বাবু না হয় তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—আমাদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ব্যবসায় মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে—সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে জাতীয় ব্যবসাগুলিকে তাহারা সম্মান করিতেছে কি না? যদি দেখ অসম্মান করিতেছে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূর করিয়া দিবে। স্বজাতীর কার্য্যকলাপ ও জীবন যাত্রার উপায় গুলিকে তাহারা ঘৃণা করিতেছে—তাহার উন্নতি-বিধানে চেষ্টা না করিয়া সমাজ-সংস্কারে উদাসীন থাকিয়া কেবল সৌখিন বাহ্যিক ভদ্র-দলের ভাবগুলি তাহারা লইবার চেষ্টা করিতেছে, তখনি বুঝিতে হইবে সে ছেলে বা যুবকগণ গোল্লায় গিয়াছে। যদি তোমরা তোমাদের ছেলেদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে চাও—তাহা হইলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা যে কোন কাজ কর তাহাও সঙ্গে রাখিয়া শিখাও। বর্ত্তমানে কৃষিই প্রাইমারী পাঠশালা—জীবন সংগ্রাম শিক্ষার প্রাইমারী পাঠশালা হইতেছে কৃষি। আমাদের ছোটলোকদের ছেলেদিগকে-কৃষিকাজে খাটাও শিখাও—সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের পাঠ পড়াও—মানুষ হইবে নচেৎ গোলামের গোলাম, গাধা হইয়া যাইবে।

আমার অনেক দিবস হইতে ইচ্ছা হইয়াছে—আমাদের পাড়ার ছেলেরা পড়ে। তাহারা এখন বুঝে নাই—গোলামীর কত মজা—ঘোষেদের রাখালী করিতে পাঠাই এইরকম আমার ইচ্ছা হয়।

তাহা হইলে দুরস্থ হইয়া আসিবে। আমি অনেক ছেলেকে পড়িবার জন্য বলিয়াছি—অনেকে পড়িতে চাহে। জ্যেঠামহাশয়কে অনেকদিন বলিয়াছি—তিনি কেবল আমাকে বলিয়াছেন—"যার বিয়ে তার চাড় নাই, পাড়া-পড়সির ঘুম নাই।"—একটু অপেক্ষা কর, তোমার পড়াশুনা ও চাষের কাজ দেখিয়া আমার ছোট-লোক ভাইদের ছেলেদিগকে পড়াইতে ইচ্ছা হয় কিনা দেখি? একটু আগ্রহ হইলে কাজটা শীঘ্র হইয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে দেখিয়া দেখিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, এখন ছেলেদের ইচ্ছা হইলেই কাজ আরও সহজ হইয়া উঠে। আমি বলিলাম অনেকে পড়িতে চাহিতেছে। জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—হারু তুমিও ছেলেদের মধ্যে চেষ্টা কর যাহাতে তাহারা পড়িবার জন্য ও চাষ আবাদ শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে—তাহাদের পিতা মাতাকে নিয়ত শিক্ষা ও কৃষির জন্য বিরক্ত করিয়া তুলে। আমিও আমার পাড়াপ্রতিবাসীদিগকে বলি। তোমার জ্যেঠাইমা মেয়েদিগকে চাষের মহিমা বুঝাইয়া পরিশ্রমের মূল্য বুঝাইয়া প্রস্তুত করিতে-ছেন। যাহাতে তাহারা তাদের ছেলেদিগকে লেখাপড়া ও চাষবাস এক সঙ্গে শিক্ষা দিতে যত্নবতী হয় তাহাই করিতেছে। আমি তোমার কথামত শীঘ্রই একটী নৈশ-বিদ্যালয় খুলিব আর অন্য সময়ে তোমার সহিত তাহারা চাষে খাটিবে। চাষে খাটা ও বিদ্যাশিক্ষা একত্রে যে না করিবে তাহাকে পড়াইব না। কেবল চাষে খাটিলেও কিছু হইবে না, কেবল স্কুলে লেখাপড়া শিখিলেও কিছু হইবে না। দুইটাই একত্রে শিক্ষা করিতে হইবে—তাহা

হইলে কেহই বাবু বা সৌখীন হইবে না—চাষের কার্য্যকে ছোট কাজ ভাবিতে পারিবে না—শরীর বলিষ্ঠ ও সুস্থ থাকিবে—দেশের ভবিষ্যৎ আশা উজ্জ্বল হইবে, নিজেও উন্নত হইবে নিজের ভবিষ্যৎ, অন্ধকার না হইয়া আলোকময় হইবে, কার্য্যকরী বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়াছে। কেবল কেতাবী বিদ্যায় চলিবে না। বহুৎ দেখিলাম। এখন চাই দুইটী বিদ্যা একত্রে একটীতে জ্ঞান বাড়াইবে আর একটীতে অন্নসংস্থান হইবে—কৃষি ও বিদ্যা, শিল্প ও বিদ্যা, বাণিজ্য ও বিদ্যা। এই রকমে দুইটী দ্বন্দ্বভাবে যাহার যাহাতে সুবিধা তাহাদিগকে তাহাই জোরের সহিত ধরিয়া শিক্ষায় অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের ছোটলোক মজুরদের পাড়ার যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা জ্যেঠামহাশয়কে ধরিয়া বসিলেন। আমাদের পাড়ার ছেলেদের পড়াইবার একটা বন্দবস্ত করিতেই হইবে। জ্যেঠামহাশয় বলিলেন যাহারা চট্‌কলে কার্য্য করিতে যায় তাহারা বৈকালে ও রবিবারে কৃষিকার্য্য করিবে আর তাহারা নৈশবিদ্যালয়ে পড়িবে। আর যাহারা কোন কাজ করে না কেবল খেলাইয়া বেড়ায় তাহারা চাষের কাজ শিখিবে ও দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের সময় দিবা বিদ্যালয়ে পড়িবে। ইচ্ছা করিলে তাহারাও রাত্রে পড়িতে পারে। সমবেত নরনারীর মধ্যে কেহ কেহ বলিল আমাদের চাষের জমি নাই। আমাদের ছেলেরা কোথায় চাষ বাস করিবে? কাজেই চাষ শিখিবার উপায় কৈ? তিনি বলিলেন একদিকে যেমন তোমাদের দিবা-বিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয়ের জন্য

ছাত্রদের উপস্থিত বেতন লাগিবে না তদ্রূপ অন্যদিকে তোমাদিগকে প্রত্যেককে কিছু কিছু টাকা দিয়া বিঘা কয়েক জমি ক্রয় করিতে হইবে। তাহাতেই উহারা কৃষি শিক্ষা করিবে—সেই কয়েক বিঘা জমিই উহাদের 'কৃষিবিদ্যালয়' হইবে। নৈশবিদ্যালয়ের জন্য একখানি ঘর আমিই না হয় তুলিয়া দিব। তোমরা সকলে কিছু কিছু করিয়া দাও। আমি চেষ্টা করিয়া জমি ক্রয় করিয়া দিতেছি। চাষবাস শিক্ষার ভার প্রথম প্রথম আমার উপর রহিল। তোমরা প্রস্তুত হও। তাহারা চলিয়া গেল। জ্যেঠামহাশয় আমাকে বলিলেন হারু—এইবার তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। তুমিই ছেলেদের আদর্শ! তোমাকেই আদর্শ করিয়া ছেলেরা শিক্ষার পথে অগ্রসর হইবে। এইবার তোমার জীবনে কর্ত্তব্য শিক্ষা হইবে। কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তোমাকে উন্নত হইতে হইবে। তোমার দ্বারা ছোটলোকের সমাজ উন্নত করিতে হইবে। বুঝেছ হারু—তোমাকে আমি কেমন কঠোর শিক্ষা-দীক্ষার পথে চালাইতে চাই।

আমি সময় নষ্ট করি না—রাত্রেই আমার পড়া শেষ করিয়া ফেলি। ভোর চারিটার সময় যখন মা, জ্যেঠাইমা, দিদি কলে কাজ করিতে গমন করেন, আমিও তাঁহাদের সহিত শয্যা ত্যাগ করিয়া আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসি। সূর্য্যোদয় হইলে জ্যেঠামহাশয়ের সহিত কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতে আরম্ভ করি। নয়টার সময় স্নান সমাপ্ত হয়। আহারাদি করিয়া বিদ্যালয়ে

গমন করি। চারিটার পর বাড়ী আসিয়া হাত পা ধুইয়া ভাত খাই। তারপর আমাদের কৃষিক্ষেত্রে গিয়া বিবিধ কাজে লিপ্ত হই। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করি। তাহার পর লেখা পড়া, যাকিছু করিয়া শয়ন করি। এই আমার আপাততঃ কার্য্যতালিকা। আমি এক্ষণে সুন্দর লাঙ্গল ধরিতে পারি। যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া লাঙ্গলদিয়া ভূমি কর্ষণ করি। 'সীরেলা' বাদ যায় না। মই দিতে পারি। দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত কোদাল দিয়া মাটি কোপাইতে পারি। দ্রোণে (দুনী) করিয়া জল ছেঁচিতে পারি। আমাদের ফসলের ক্ষেত্রগুলি সাধ্যমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখি। শাক-বজী, গাছপালায় একটি পাকা পাতা রাখি না। কোন প্রকার পোকা দেখিলেই যত্ন-সহকারে মারিয়া ফেলি—শুঁয়ো পোকা, ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি ফসলের বড়ই ক্ষতি করে তা বুঝিয়াছি বলিয়া, বিবিধ পোকা মাকড়ের গতিবিধি ও বংশ-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখি। জ্যেঠামহাশয় কৃষিবিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক আনিয়াছেন। তাহা আমাকে পড়িতে হয়—ইহা আমার কৃষি-পাঠশালার পাঠ্য। শনিবার রবিবার, দুইদিন কৃষিবিষয়ক পুস্তক পড়িতে হয়। চাষে খাটিতে খাটিতে যখন একটু বিশ্রাম করি, সেই সময়ে প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে আমি অল্প অল্প কৃষিপুস্তক পাঠ করি। দিন ও রাত্রটি যেন আমার নিকট খুব ছোট হইয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হয় প্রাতঃকাল হইবার পর জমিতে কাজ করিতে না করিতে নয়টা বাজিয়া যায়। কাজ কিন্তু কম হয় না।

আমার জীবনের যতকিছু শিক্ষা তাহার অধিকাংশ আমি আমার জ্যেঠামহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। তিনি কর্ম্মের পন্থা দেখাইয়া কাজের উপর ছাড়িয়া দিতেন—ভাল মন্দের দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন কিন্তু কাজের সময় কোন কথাই বলিতেন না। ভাল মন্দের দায়িত্ব আমারই থাকিত। আমাকে বাধ্য হইয়া কাজ দেখিয়া কাজ করিতে হইত। অনেক সময়ই নিজের বুদ্ধিতে কাজ করিতে বাধ্য হইতাম। কৃষিক্ষেত্রের কোথাও 'অকেজো' কোন কিছুই নাই। এমন কি ক্ষেত্রের বেড়াও কাজের আর পয়সা উপার্জ্জনের গাছ পালায় প্রস্তুত। সমগ্র ক্ষেত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সুশৃঙ্খলে সকল ফসলের সারি বিদ্যমান। এই সকল যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা তিনি বারংবার বলিতেন। একটী ক্ষুদ্র ছুঁচ পর্য্যন্ত যথাস্থানে সুশৃঙ্খল ভাবে সজ্জিত থাকিত। যদিও দেওয়ালের উপর তৃণের ছাউনি তত্রাচ গৃহগুলি এতাদৃশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে অনেক ইষ্টক গৃহও ততদূর সুন্দর নহে। এই সকল ঘর জ্যেঠার নিজের হাতের। হুগলী আসার পর দুইখানি ঘর আমরা সকলে মিলিয়া করিয়াছি। সেই অবকাশে আমি দেওয়াল দিতে, ঘর কাটাম করিতে ও 'ছাইতে' শিখিয়াছি। ঘরের লেপা পোছার কাজগুলি জ্যেঠাইমা, মা ও দিদিকে শিখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তিনজনে একত্রে ঐ কাজ করিতে করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের অনেক সময় মাটী বহিয়া দিয়াছি। আমরা ছোটলোক, আমাদের কাজ আমাদিগকেই করিতে হয়। সংসারের সকল

কাজই আমাদিগকে নিজের নিজের পায়ে হাতে করিয়া লইতে হয়। বাঙ্গালা পুস্তকে রবিনসন ক্রুশোর গল্প পড়িয়াছি—তাঁহাকেও নিজের উপর নির্ভর করিয়া যেমন সেই দ্বীপে অনেক কাজ করিতে হইয়াছিল—আমার জ্যেঠামহাশয়কে তাঁহার অপেক্ষাও কর্ম্মী বলিয়া মনে হইয়াছে। জ্যেঠামহাশয় রিক্তহস্তেই এই হুগলীর সংসার পাতাইয়াছিলেন। জীবহিংসা বা অপরকে গোলামী করিবার জন্য জোর করিয়া বা কৌশল করিয়া আপনার সেবায় নিযুক্ত করেন নাই। তিনি স্বয়ং এই সকল গড়িয়া লইয়াছিলেন। আমাদের দেশে ছোটলোকগুলির আদর্শস্থানে তাঁহাকে বসাইয়া আমি আজিও আমার জীবন গঠন করিতেছি। জ্যেঠামহাশয় তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে গোলামকে কর্ম্মী করিয়াছেন—গোলাম জাতিকে স্বাধীন ভাবে আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিক্ষা দিয়াছেন। যদিও আমাদের ছোটলোকেরা সভ্য-সংসারে স্বাবলম্বনের পক্ষে শিশু কিন্তু তিনি আমাদিগকে হাত ধরিয়া নিজের দেহভার নিজেকেই বহন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গোলামের জাতিকে গোলাম করিয়া সভ্যতা শিক্ষা দেন নাই। অসভ্য ছোটলোকদিগকে তিনি স্বাধীনতার সুমিষ্ট, সুপুষ্ট ফলাস্বাদন দ্বারাই সভ্য ও স্বাধীন বৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিয়াছেন। তিনি মজুরী করিতে শিক্ষা দিয়াছেন কিন্তু তাহাতে গোলামীর গন্ধমাত্র নাই। সেই কারণে তাঁহার চরিত্র আমাদের আদর্শ হইয়াছে।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়"

জ্যেঠামহাশয় নিজে কাজ করিয়া তাহার সুফল দেখাইয়া অপরের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেন। আমাদের গরীব গোলাম ছোটলোকগুলি তাঁহার গন্তব্যপথ সুপথ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গড়াপথে চলিয়াছিল। তিনিই আমাদের জন্য পথ প্রস্তুত করিতেন। আমরা নিজেই যাহাতে পৃথক্ পৃথক্ সুপথ নিজ নিজ বুদ্ধির বলে গড়িয়া লইতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতেন। তিনি আমাদের জীবন গঠনের ধ্রুবতারা।

আমার পারিতোষিক পাইবার পর আরও ছয়মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আমাদের ছোটলোক কুলীর পাড়ার বাহিরে একটা পুষ্করিণীর তীরে একটী নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্করিণী ও উহার চারিপাশে প্রায় বার বিঘা জমি বন্দবস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। হুগলীর মাটি সরস বলিয়া এস্থানে উদ্ভিদগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই নূতন বন্দোবস্তী জমি ঝোপ ঝোপ বনে পূর্ণ। পুষ্করিণীটি পানা, দাম প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে একেবারে পরিপূর্ণ। এই জমিটি পূর্ব্বে কাহার ফলের বাগান ছিল এখন জঙ্গলে পূর্ণ। আম, লিচু, কাটাল, নারিকেল ও খেজুর গাছ অনেকগুলি আছে। খেজুর ও নারিকেল বৃক্ষ ব্যতীত অপর গাছগুলিকে বন ও লতাতে ঢাকিয়া মৃতপ্রায় ও নির্জ্জীব করিয়া ফেলিয়াছে। এই স্থানের অবস্থা দেখিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল চাষবাসের উপযুক্ত হইবে না। কিন্তু দেখিলাম এবং শিক্ষা করিলাম, মানব মনে করিলে, গভীর বনের মধ্যেও সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিতে পারে। বন জঙ্গল পরিষ্কার

করিয়া যে সুন্দর চাষের জমি প্রস্তুত হইতে পারে এ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। নৈশবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ব্যপদেশে আমি তাহাতে বিজ্ঞ হইয়া উঠিলাম। যে জমি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সেই জমি তারাপদ বাবুর। শ্যামাপদের চেষ্টায় আমরা আমাদের ছোটলোক বালকগণের নৈশবিদ্যালয় ও কৃষিক্ষেত্রের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিয়াছি। আমাদের পাড়ার সকলে বাড়ী বাড়ী চাঁদা করিয়া যে টাকা তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাতে ছয় বিঘা জমিই ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যেঠামহাশয় আমাদের অংশের চাঁদা বাবত কুড়ি টাকা দিয়াছিলেন। এত অধিক টাকা আর কেহ দিতে পারে নাই। চাঁদার টাকায় নৈশবিদ্যালয়ের জন্য মোটে ছয় বিঘা জমি ক্রয় করা হইল। ঐ জমিতেই নৈশবিদ্যালয় ও কৃষিবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। জ্যেঠাই মা, মা ও দিদির চটকলের মাহিনা জমা ছিল, তাহাতে পুষ্করিণী ও আর ছয় বিঘা জমি জ্যেঠামহাশয় আমার মাতার নামে জমা করিয়া লইলেন। আমি সেই সময় জ্যেঠামহাশয়কে বলিয়াছিলাম—ঐ জমি নৈশবিদ্যালয়ের ও কৃষি-বিদ্যালয়ের হইলে ভাল হইত। তিনি বলিলেন—তাহা নিশ্চয়। কিন্তু আমি আর একটা আদর্শ দেখাইতে চাই। চটকলের টাকায়, মেয়েরাও জমি ক্রয় করিতে পারে। আমাদের ছোটলোকদের পাড়ার সকলে চাঁদা দিয়া মোট ছয় বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিলাম, আর এই স্ত্রীলোক তিনটীর চটকলের

মাহিনার টাকায় একটী পুষ্করিণী ও ছয় বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইলাম। ইহাতে দেখিতে পাইবে বৎসরের মধ্যে কি ফল ধরে।

আরও দেখাইতে হইবে চটকলের কার্য্য করিতে করিতে তাহাদের বেতনের টাকা হইতে ও তাহাদের অবকাশ কালের পরিশ্রম দ্বারা তাহারা তাহাদের পুষ্করিণী ও ছয় বিঘা জমিতে কেমন ফসল উৎপন্ন করে ও কত লাভ করিতে পারে। পাশাপাশী জমিতে প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করিতে পারিলেই আমাদের ছোটলোকদের মধ্যে কেমন আগ্রহ দেখা দেয় এটারও পরীক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ আমরা অগ্রে, আরও অগ্রে অগ্রসর হইতে পারিব না। এইবার তোমার জ্যেঠাই মা, তোমার মা ও তোমার দিদি ও তুমি ঐ জমিতে খাটিবে। আমাদের জমির ভার আমার রহিল। আমাদের গাই দুইটীর যে প্রথমকার দুইটী বাছুর আছে সে দুইটী লাঙ্গল টানিতে অভ্যস্থ হইয়াছে। ঐ দুটী লইয়া তোমাকে এই নূতন জমি চষিতে হইবে। হারু এই এতদিন তুমি আমার সঙ্গে, আমার বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করে যা শিক্ষা করিয়াছ তাহাতে তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ—তুমি পারিতোষিক পাইবার যোগ্য হইয়াছ। সেই জন্য তোমার জ্যেঠাই-মা, মা ও দিদি তোমাকে ঐ এঁদোপুকুর ও জঙ্গলা ছয় বিঘা জমি পুরস্কার দিয়াছেন। এখন তোমাকে আমার সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমি যাহা করিতেছি যে রকম ফসল উৎপন্ন করিতেছি—যে রকম জমির বিভাগ

করিয়া ক্ষেত প্রস্তুত করিয়া আবাদ করিতেছি, পুকুর হইতে জল দিবার বন্দবস্ত করিয়াছি, সকলি তোমাকে নিজের বুদ্ধিতে করিয়া লইতে হইবে। মর্ষুমী ফসল উৎপন্নের কায়দা কসরৎ তোমাকেই করিতে হইবে, আমি কিছুই করিয়া দিব না। কিছুই বলিয়া দিব না। তোমাকেই কর্ত্তা হইয়া সকলই করিতে হইবে, আর তোমার কার্য্যের সাহায্য করিবেন তোমার দিদি, তোমার মা, আর তোমার জ্যেঠাই মা। তুমি যখন পারিতোষিক পাইয়াছ তখন ইহার জ্ঞানার্জ্জনে তোমাকেই খাটিতে হইবে। এই ছয় মাসের মধ্যে তোমার স্কুলের পারিতোষিক প্রাপ্ত পুস্তকগুলি পড়িয়া শেষ করিয়াছ। স্কুলের পড়া করিয়াছ। আমাদের চাষের জমিতে খাটিয়াছ। পাড়ার ছেলেদিকে পড়াইয়াছ। এইবার ছয় মাসের মধ্যে তোমার পুরস্কারের—তোমার কৃষি-বিদ্যালয়ের পুরস্কারের জমি ও পুকুর ছয় মাসের মধ্যে পড়িয়া শেষ করিতে হইবে আর আমার চাষে খাটা বাদ দিয়া সকল কার্য্যই করিতে হইবে। তাহা হইলে তুমি নূতন বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কারের যোগ্য কি না বিবেচিত হইবে। স্কুলের পাঠে তোমাকে যদ্রূপ প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইবে তদ্রূপ কৃষি-পাঠশালার হাতেকলমের পরীক্ষায় তোমাকে প্রথম স্থানেই দাঁড়াইতে হইবে। আমার বেশ মনে আছে আমি জ্যেঠামহাশয়কে বলিয়াছিলাম 'তাহা হইলে কি আমাদের চাষে আমি খাটিতে পাইব না? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই—

তোমার কৃষি-পাঠশালার কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া যদি অবকাশ করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। তোমার কৃষি-পাঠশালার যেন কোন ক্ষতি না হয়।

আমি বলিয়াছিলুম আমাদের পাড়ার নৈশবিদ্যালয় ও কৃষি-বিদ্যালয়ের কাজ কে করিবে। তিনি বলিয়াছিলেন—সে ভার আমার উপর থাকিল যাহাতে ভাল কাজ হয় তাহা আমি করিব। আর হারু! তোমাকে আমার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া শিখিয়া লইতে হইবে—দশের কাজ কি করিয়া করিতে হয়, দশকে কি করিয়া দশের কাজে খাটাইয়া তাহাদের মধ্যে কর্ম্ম জাগাইয়া তুলিতে হয় তাহা তোমাকে শিক্ষা করিতে হইবে। হারু, তোমার পুরস্কারপ্রাপ্ত চাষের জমিতে তুমি কর্ত্তা হইয়া খাটিবে। তোমার জমির 'লাগালাগি' জমিতে কুড়িটী চাষে অনভিজ্ঞ শ্রমকাতর তোমার মত ছোটলোকের ছেলে খাটিবে। একদিকে তুমি, অন্যদিকে কুড়িটী বালক। তাহাদের সহিত প্রতিযোগীতায় তুমি যদি শ্রেষ্ঠ হইতে পার, তাহা হইলে তোমার কৃষি-পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ হইবে, নচেৎ নহে—ইহা মনে রাখিও। তোমাকে যেন তাহারা আদর্শ ভাবিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে শিক্ষা করে। তোমার বিদ্যালয়ের উন্নতি দেখিয়া তাহারা বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে। সুতরাং তোমার কোনদিকে একটু 'ঢিল' দিলে—তুমিও ঠকিবে আর এই কুড়িটী বালকের উন্নতির বেগ প্রতিহত হইয়া যাইবে। বুঝিয়াছ হারু, তোমাকে আমি কেমন ভীষণ পরীক্ষার দুইটী রাস্তার মাঝে ছাড়িয়া দিলাম?

জ্যেঠামহাশয়ের কথায় আমি আনন্দিত হইলাম। আমার দেহ নূতন উৎসাহে, নূতন বলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যেঠা-মহাশয় বলিলেন—হারু তোমার কৃষি-পাঠশালার জন্য কি কি দ্রব্যাদির আবশ্যক তাহার একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিও। সেইগুলি রবিবার দিবস বাজারে গিয়া ক্রয় করিতে হইবে। আমি তোমার সহিত সেই দিন বাজারে যাইব। রবি-বার আসিতে বিলম্ব সহিল না—আমি শনিবারের মধ্যেই ফর্দ্দ দাখিল করিলাম। জ্যেঠামহাশয় ফর্দ্দখানি দেখিলেন। শনিবার অপরাহ্নে বিদ্যালয় হইতে আসিয়া, আহারাদি শেষ করিবা-মাত্র জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—হারু, এস বাগানে যাই—দুটা ঝাঁকা লইয়া আমার সহিত এস। আমি বড় ঝুড়ি দুইটা লইয়া জ্যেঠার সঙ্গে জমিতে যাইলাম। বাগানে গিয়া, তরি তরকারী, কলা, মোচা, কলাপাতা, খাম আলু, পেঁপে প্রভৃতি দ্বারা দুইটা ঝাঁকা পূর্ণ করিয়া উপরে দড়ি দিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাঁধা হইল। আমি বলিলাম—বাঁধিয়া রাখিতেছেন পাইকার কি আসিবে না? জ্যেঠা হাসিয়া বলিলেন—আমরাই অদ্য পাইকার হইয়াছি। চাষার ছেলের লজ্জার পরীক্ষা কাল হইবে; তুমি সেই পরীক্ষা দিবে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। জ্যেঠা ও আমি দুই জনে সেই তরকারীর বোঝা মাথায় করিয়া বাড়ী আসিলাম।

অদ্য রবিবার, প্রাতঃকাল হইয়াছে। আমি প্রতিদিন জ্যেঠাই-মার পাতে ভোরে ভাত খাইতাম। অদ্য তাঁহাদের চটকলের

ছুটী তত্রাচ তাঁহারা রবিবার দিবস ভোরে ভাত খাইয়া আমাদের জমিতে কাজ করিতে যাইতেন। দিদি গাই দুহিত। বাটীর জন্য কিছু দুধ রাখিয়া তাঁহারা দুধ লইয়া চটকলে যাইতেন। সেই দুধ সাহেব লইতেন। আমাদের নিকট খাঁটী দুধ পাইতেন বলিয়া চটকলের সাহেব টাকায় পাঁচ সেরের দরে দুধ লইতেন। রবিবার জ্যেঠাই মা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই দুধ দিতে যাইবার পূর্ব্বে ভাত খাইয়া দুধ লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পাতে ভাত খাইলাম। মা ভাত রাঁধিয়াছিলেন। তাহার পর জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—হারু এস। আমি তাঁহার নিকটে যাইলাম। তিনি বলিলেন—কাপড়টা 'মালকোচা' করিয়া পর। আমি তাহাই করিলাম। তৎপরে বলিলেন—গামছার বিড়া পাকাও। আমি বিড়া পাকাইলাম। তিনিও তাঁহার গামছায় বিড়া পাকাইলেন এবং নিজের মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন,—তুমিও তোমার বিড়া আমার মত মাথায় রাখ। আমি তাহাই করিলাম। উঠানে মাচার উপর তরিতরকারির ঝাঁকা ছিল। তিনি একটু উবুড় হইয়া বড় ঝাঁকাটা মাথায় করিয়া বলিলেন—আমার মত এই ছোট ঝাঁকাটা মাথায় লও। আমি তাহাই করিতে যাইতেছি এমন সময়ে দিদি আসিয়া ঝাঁকাটী আমার মাথায় তুলিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল। জ্যেঠা তাহাকে বলিলেন—'বিন্দু' তুমি আপনার কাজ করগে? নিজের বোঝা নিজেই আপনার মাথায় তুলিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। আমার বোঝা অপরে তুলিয়া দিলে তাহাতে সুখ হয় না। নিজের বোঝা, নিজের হাতে, নিজের মাথায় লইয়া

হাটে বাজারে যাইতে হয়। আমি নিজের বোঝা নিজেই তুলিয়া লইলাম। জ্যেঠামহাশয় অগ্রে—আমি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছি। আমাদের পাড়ার বাহিরের পথদিয়া বাজার যাইতে হয়। কিন্তু জ্যেঠামহাশয় আমাদের পাড়ার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া চলিলেন—আমিও চলিলাম। আমাদের পাড়ার মধ্যে গিয়া দেখি পাড়ার ছেলেরা কেহ খেলা করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, স্ত্রীলোকেরা জটলা বাঁধিয়া কেহ ঝগড়া করিতেছে, কেহ কাহার নিন্দা করিতেছে, কেহ বা কাজ করিতেছে। পুরুষেরা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে আর নানান গল্প করিতেছে। তাহারা আমার দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল, জ্যেঠাকে বলিতে লাগিল—আজ হারুকে লইয়া মোট বহিয়া বাজার যাইতেছ, আজ কি পাইকার আসে নাই ? জ্যেঠা বলিলেন—পাইকারকে দিয়াও বেশী হইয়াছে, তাই দুই জনে চলিয়াছি। একজন বলিল—ঝাঁকা করিয়া তরকারী বাজারে লইয়া যাওয়াটা যেন কেমন কেমন ঠেকে! জ্যেঠা বলিলেন—নিজের জিনিষ দাদা! বিক্রয় করে নিজেদের পয়সা হবে। কাহারও ত মোট বহিতে যাই নাই, এতে লজ্জা কি ? আমরা পাড়া ছাড়াইয়া বাজারের অভিমুখে চলিলাম। ছেলেরা আমার দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

আমি আজ বাজারে চলিয়াছি। আমাদের ছোটলোকদের পাড়ার লোকে বলে কি ? নিজের চাষের দ্রব্যাদি নিজেরাই লইয়া যাইতেছি—আমরাই বিক্রয় করিব; ইহার মূল্য বাবতে যাহা হইবে তাহা আমাদেরই হইবে। ইহাতে মান ছোট হইয়া

যাইবে? আমাদের সংসারের মধ্যে মানের পরিমাণ কত তাহা কি কেহ অবগত নহে? নিজের মান নিজেই যদি মনে করি খুব উচ্চ তাহা হইলে কি মানী হইতে পারা যায়? মানের পরিমাণ কি নিজে নিজে বাড়ান যায়? এটা কি কল্পিত মান নহে? নিজের মনে খুব মস্তলোক হইয়া পড়িয়াছি, যারা মনে করে—আমার মনে হয় তারাই খুব ছোট। যাহারা নিতান্ত মানহীন, জ্ঞানহীন তাহারাই নিজের মান, নিজের জ্ঞান, খুবই বড় দেখে, বোধ হয়! আমি যাহা, তাহার পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ কি জীবের ধর্ম্ম? তাহা ত হইতেই পারে না! আমি মহৎ নহি, মহত্ত্ব আমাতে কিছুই নাই—তত্রাচ আমি মহৎ ইহা দেখান আত্মদৌর্ব্বল্যের নিদর্শন। এই ব্যাধিতেই আমরা মরিতেছি। আমি কদাকার, কুরূপ হইয়াও যদি নিজের মনে সুশ্রী মনে করি—তাহা হইলে কি লোকলোচন সমক্ষে সুশ্রী দেখাইবে? কখনই নয়! দরিদ্র যদি মনে মনে ধনী ভাবে—তাহা হইলে কি সে ব্যক্তি ধনী হইতে পারে? ইহাই ত অধঃপাতের একটী প্রশস্ত কারণ! আমরা ছোটলোক কৃষক, আমাদের কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি যদি পাইকারকে বিক্রয় না করিয়া নিজেরাই মাথায় করিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করি তাহা হইলে দ্রব্যের আবশ্যক হিসাবে, বাজারের বিক্রেয় দর দেখিয়া, আমাদের ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের সম্ভব। কোন্ ফসলের কি দর তাহা জ্ঞাত হইয়া আমরা বিজ্ঞ হইব। আমাদিগকে পাইকারগণ ঠকাইয়া লইতে পারিবে না। বাজারে

কোন্ কোন্ ফসলের আদর বেশী, কাট্তি বেশী তাহা দেখিয়া লইয়া, আমাদের চাষের ক্ষেত্রে তাহার আবাদ করিয়া প্রচুর লাভ করিতে সমর্থ হইব। ইহাতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইবে এবং উপার্জ্জনের সুযোগ হইয়া যাইবে। ভদ্র হইবার সাধ কাহার নাই? ভদ্র হইতে হইলে জাতীয় ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি অন্ন সংস্থানের প্রকৃষ্ট উপায়গুলি ত্যাগ করিয়া শ্রমকাতর বিলাসী হইলেই কি ভদ্র, সভ্য হয়? এ ভ্রম কবে আমাদের মধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে? বাবুগিরি, আলস্য, বিলাসিতা বর্জ্জনই যে সভ্যতার, ভদ্রতার লক্ষণ তাহা আমরা ভুলিয়াছি বলিয়াই ত আমাদের এত কষ্ট—সেই জন্যই ত আমরা অসভ্য বর্ব্বর হইয়াছি। আমরা কৃত্রিমতা ভালবাসিয়াছি, আমরা ছদ্মবেশ ভালবাসি, সত্য গোপন করিতে গিয়াই আমরা ঠকিতেছি। সংসারে আমরা জিতিতে পারিতেছি না। কেবল হারের পাল্লায় বোঝা চাপাইয়া ভারি হইতেছি—আর ডুবিতেছি! আমরা চাষা, চাষের কার্য্যে উন্নতি করিয়া বড় হইতে পারিলে নিশ্চয় আমরা ভদ্র, সভ্য ও বড় হইয়া যাইব। যাহাদের মান নাই, তাহাদের মানের কান্না কেন? আমরা চাষার ছেলে, চাষের মধ্যদিয়াই মান বাড়াইয়া লইব। আমরা যে চাষা, আমরা যে দরিদ্র তাহাত সকলেই অবগত আছে—তবে তাহাদের নিকট বাবু সাজিয়া বড় হইলে কি বড় হইতে পারিব?

এই রকমের কতভাবই আমার মনে উদয় হইতেছিল। আমি রাস্তা চলিতেছি আর এই রকমের চিন্তা করিতেছি। জ্যেঠা

মহাশয় বলিলেন—হারু এসেছ ? আমি বলিলাম—আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছি। তিনি বলিলেন—এস বাজারের মধ্যে গিয়া বোঝা নামাই। বাজারে প্রবেশ করিলাম। যে স্থানে তরি-তরকারী বিক্রয় হয় তথায় যাইলাম। জ্যেঠামহাশয় এক হাতে আমার বোঝা নামাইবার সাহায্য করিলেন। আমি বোঝা নামাইয়া মাথার বিড়াটা বোঝার উপর রাখিয়া জ্যেঠামহাশয়ের বোঝাটি নামাইবার জন্য দুইটী হাত বাড়াইলাম—তিনি একটু নত হইয়া আমার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। বোঝা নামাইয়া উভয়ে একটু পা-চারি করিলাম। পরে নিজ নিজ বোঝা খুলিয়া, ছেঁড়া কলাপাতা বিছাইয়া নিজ নিজ ঝাঁকার দ্রব্যাদির কিছু সাজাইয়া বসিলাম। জ্যেঠামহাশয় যে প্রকারে সাজাইলেন আমিও সেই প্রকারে সাজাইয়াছিলাম। আমার মত, জেঠার মত, জ্যেঠাই মা, ও মায়ের মত কত নরনারী বাজারে সাকসব্জী, ফল, মূল বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। নিমন্ত্রণ বাড়ী আহারে বসিবার মত সারি দিয়া হাটুরিয়াগণ বসিয়াছে। কত স্ত্রী ও পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, বাজার করিতে আসিয়াছে। আমার চিন্তা হইল—কোন্ জিনিষ কোন্ দরে বিক্রয় করিব। আমার মত দ্রব্য-সম্ভার লইয়া যাহারা আমার পার্শ্বে, সম্মুখে বিক্রয় করিতেছে। তাহারা কোন্ জিনিষ কি দরে বিক্রয় করে তাহা দেখিতে আরম্ভ করিলাম। হাটুরিয়ার দর শুনিয়া গ্রাহকগণ কি দর বলিতেছে—কোন্ দরে জিনিষের বেচা কেনা হইতেছে লক্ষ্য রাখিলাম। তদপেক্ষা আমার জিনিষ ভাল কি মন্দ সেই হিসাব করিয়া আমিও বিক্রয় আরম্ভ

করিলাম। জ্যেঠামহাশয় এমন কতকগুলি ফল, মূল আমার ঝাঁকায় দিয়াছেন যাহা তাঁহার ঝাঁকায় আদৌ নাই। সুতরাং জ্যেঠামহাশয় কি দরে ঐ সকল বিক্রয় করিবেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। আমি একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—জ্যেঠা কি দরে বিক্রয় করিব? তিনি বলিলেন—না ঠকিলেই হইল? আমি বুঝিলাম আজ আমার আর একটী পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিলাম। আপন মনে বিক্রয় করিতেছি—আমার একটী বড় পেঁপে ও একটী অসময়ের আনারস ছিল। অনেকেই দর করিতেছে, দর বলিতেছে না। ভিড়ের মধ্যে একজন দর করিল—আমি মাথা হেঁট করিয়াই পেঁপেটীর দাম দুই আনা ও আনারসের দাম চারি আনা বলিলাম। একটী হাত আমার সম্মুখে দেখা দিল তাহাতে একটী দোয়ানী ও একটী সিকি রহিয়াছে। আমি মাথা তুলিয়া দেখি শ্যামাপদ ঐ দুটীর দাম দিতেছে—তাহার পশ্চাতে তারাপদ বাবু দাঁড়াইয়া আমার প্রতি তাকাইয়া আছেন। আমি শ্যামাপদকে বলিলাম—তোমরাও বাজারে এস? শ্যামাপদ বলিল—আমরা রবিবার বাজারে আসি। বাজার দেখিয়া জিনিষপত্রের ভাল মন্দ, দর দাম শিক্ষা করি। আজ তুমিও যে বাজারে আসিয়াছ? বাজারটা দেখিতেছি কৃষি-প্রদর্শনী। কৃষির পরীক্ষা এখানে যেমন হয় প্রদর্শনীতে তেমন বোধ হয়, হয় না।

জ্যেঠামহাশয় বলেন—বাজারটী কৃষি-কলেজের এক প্রধান বিভাগ। এই বিভাগের পাঠ সমাপ্ত করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত

হইয়া যায়। আজ আমি 'কৃষি-কলেজে ভর্ত্তি' হইয়াছি ভাই? একবার মনে করিলাম ফল দুটীর দাম লইব না। কিন্তু তাহা পারিলাম না। কেবল বলিলাম—তুমি ভাই একদরে ফল দুটী লইবে তাহা বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং বাজার হিসাবে দাম কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। পেঁপেটী ছয় পয়সা, আনারসটী বার পয়সা এই সাড়ে চারি আনা আমাকে দাও। শ্যামাপদ তাহাই দিয়া ফল দুটা লইয়া গেল। তারাপদ বাবু একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমার দর দস্তুর দেখিতেছিলেন—আমি ক্রেতাগণের সহিত সৎ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি, সেই জন্য স্ত্রীলোকদিগকে 'মা' ও পুরুষদিগকে 'দাদা' সম্বোধনে বিনীতভাবে কথা বলি। ক্রেতারা অসম্ভব দর বলিলেও কিছু অন্যায় উত্তর দিই না। জ্যেঠামহাশয় ঐ প্রকারেই বিক্রয় করেন—আমি নিয়ত দেখিয়াছি। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তারাপদ বাবু আমার ও জ্যেঠামহাশয়ের বিক্রয় ব্যাপার দেখিয়া কখন চলিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বিক্রয় শেষ হইয়াছে। আমরা পয়সা গণিলাম, আমার দুই টাকা চারি আনা ও জ্যেঠামহাশয়ের আড়াই টাকা হইয়াছে। জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—হারু এইবার আমাদের আর একটী কাজ করিতে হইবে। তোমার ফর্দ্দের দ্রব্য কয়টী দোকান হইতে ক্রয় করিতে হইবে। চল দোকানে যাই। বাজার হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়া জ্যেঠামহাশয় একটা কামারের দোকানে প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মকার লোহা পিটিতেছিল। জ্যেঠা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি লোহাটা

‘হাপোরে’ দিয়া জাঁতা টানিতে টানিতে বলিলেন—এই তোমার ‘হারু’ নাকি ? জ্যেঠা উত্তর দিলেন—হাঁ দাদা। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—বেঁচে থাক। আমার ছেলের জন্য আমি খুব যত্ন করে জিনিষগুলো তৈরি করিয়া রাখিয়াছি। আমার হারুর নূতন চাষের অস্ত্রসস্ত্র বেশ মজবুত করিয়া গড়িয়াছি। নিবারণ! তোমার কাকা এসেছেন তামাক দাও। নিবারণ তামাক সাজিয়া আনিল ও জ্যেঠার হাতে দিল—জ্যেঠা তাঁহার দাদার হাতে দিতে যাইলে তিনি বলিলেন—তুমি লও লোহাটা হয়েছে, পিটিয়ে লই। এই বলিয়া লাল লোহাটা বাহির করিয়া দমাদম্ হাতুড়ির ঘা দিতে লাগিলেন—আগুনের ফুল্কি চারিদিকে ছিটিয়ে পড়িতে লাগিল। লোহা পিটাইয়া হাপোরে দিয়া বাম হাতে জাঁতা টানিতে আরম্ভ করিলেন—আগুন ফোঁশ ফোঁশ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। জ্যেঠা হুঁকা দিলেন। জ্যেঠা আমাকে বলিলেন “নিবারণ তোমার দাদা হন প্রণাম কর।” আমি নিবারণ দাদাকে প্রণাম করিলাম। দাদা আমাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া বুকে টানিয়া লইলেন। দাদা যুবক। কামার জ্যেঠা বলিলেন—তোমার ভাইটী আজ নূতন আসিয়াছে, তাহাকে কিছু জল খাইতে দাও। দাদা আমার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

নিবারণ দাদা আমার যেন ঠিক দাদা। আমার দাদা নাই দাদা পাইয়া দাদা বলিতে পাইয়া আমার প্রাণটা শীতল হইয়া গেল। নিবারণ দাদার মা আমাকে আদর করিয়া বসাইলেন। একটা ছোট মেয়ে দৌড়িয়া আসিল, কামার-মা তাহাকে

বলিলেন—আমার ছেলে হারু—তোর দাদা, প্রণাম কর। আমাকে সে প্রণাম করিল—আমি তাহাকে কোলে লইলাম। আমার ছোট ভগ্নী নাই—আমি ছোট ভগ্নীকে কোলে করিয়া যে কি তৃপ্তি পাইয়াছিলাম তাহা আর কি বলিব। সে কেবল বলিতে লাগিল "দাদা আমাদের বাড়ী আসে না কেন মা ?" কামার-মা আমাকে সন্দেশ খাইতে দিলেন—আমি তাহার একটা তুলিয়া আমার ভগ্নীকে দিলাম। বাহির হইতে জ্যেঠা ডাকিলেন—হারু ? আমি "আজ্ঞে যাই" বলিয়া কামার-মাকে প্রণাম করিয়া উঠিলাম। তিনি সস্নেহে বলিলেন—হারু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিও। আমি বলিলাম "আসিব"। দাদা, ছোট বোন্‌টী আমার সহিত বাহিরে আসিল।

কোদাল, কুড়াল, দা, হাঁস্থয়া, কাস্তে, সাবোল, খোন্তা লইয়া জ্যেঠা দেখিতেছেন। জ্যেঠা আমাকে দেখিয়া বলিলেন—দেখ হারু কেমন হইয়াছে। অতি সুন্দর হইয়াছে। দরদাম মিটাইয়া দিয়া জ্যেঠামহাশয় কামার জ্যেঠাকে বলিলেন—একখানা ধূলার ও একখানা কাদার ফাল গড়িয়া রাখিবেন। হারু আসিয়া লইয়া যাইবে। জ্যেঠাকে প্রণাম করিয়া—ছোট বোন্‌টীকে আর এক-বার কোলে করিয়া, দাদাকে "আসি" বলিয়া ঝাঁকার উপর জিনিষগুলি লইয়া বাড়ী রওনা হইলাম। এইবার আমাদিগকে তারাপদ বাবুদের বাড়ীর নিকট দিয়া আসিতে হইল। তারাপদ বাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া বাহিরে আসিলেন। জ্যেঠামহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আমিও ঝাঁকাটী রাখিয়া প্রণাম

করিলাম। তারাপদ বাবু জ্যেঠাকে বলিলেন—দীননাথ তুমি বৈকালে বাড়ী থাকিবে? জ্যেঠা বলিলেন—আজ্ঞে? তারাপদ বাবু বলিলেন—আজ আমি বৈকালে তোমাদের বাড়ী যাইব—বুঝেছ হারু—তোমার শ্যামাপদও তোমাদের বাড়ী যাইবে। আমরা প্রণাম করিয়া ঝাঁকা লইয়া বাড়ী আসিলাম।

আহারাদি সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় প্রহরে আমি, জ্যেঠাইমা ও মা নূতন জমিতে যাইলাম। আমাদের জমির সীমাটী পূর্ব্বে পগার দিবার চিহ্নে চিহ্নিত ছিল। প্রথমে একবার জমিটির চারিদিক দেখিয়া লইলাম। পুষ্করিণীটি দেখিলাম। তৎপরে আমি বন কাটিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে বন, জঙ্গল, ঝোপ প্রভৃতি কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলাম। বেড়ার কার্য্যে যেগুলির প্রয়োজন হইবে সেগুলি পৃথক্ করিয়া রাখা হইল। মা আমার কাটা গাছগুলি টানিয়া একস্থানে জমা করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যেঠাইমা বেড়ার খুঁটা ও অপর কার্য্যের জন্য অংশ-গুলি পৃথক্ রাখিয়া, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য টুকরা টুকরা করিয়া কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রকমে আমরা আমার নূতন কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলাম।

জ্যেঠামহাশয় আমাদের পাড়ায় গিয়া 'রবিবার বিদ্যালয়' ও নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নূতন নৈশবিদ্যালয়-গৃহে তাহাদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সামান্য পড়িবার পর সকলে দা ও হাঁসুয়া লইয়া জ্যেঠামহাশয়ের সহিত নৈশবিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্রে গমন করিল। গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত

হইলেন—স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহই দেখিতেও যাইল না। আমরা যেদিকে বন কাটিতেছি সেই পার্শ্বেই ছেলেদের সহিত জ্যেঠামহাশয় আগমন করিয়া বন কাটিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের মধ্যে যে সকল ছেলে আমার মত বড় বা যুবক তাহারা তালের রস খাইয়া নেশা করিতে গিয়াছে। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের সহিত গিয়াছে। আজ রবিবার বিশ্রামের দিন—আমোদ আহ্লাদে দিনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। আজ আবার পরিশ্রম করিব কেন ? এ ধারণা তাহাদের বেশ হইয়া গিয়াছে। তাহারা সেই জন্য বিদ্যালয়ের কথা, কৃষিক্ষেত্রের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। যাহাদের মনে আছে, তাহারা আমার অপেক্ষা ছোট। আর তাহাদের অভিভাবকগণের মধ্যে যাঁহারা ক্ষেত্রে আসিয়াছেন—তাঁহারা কার্য্য করিতে আসেন নাই। একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে দেখিতে আসিয়াছেন মাত্র। জ্যেঠামহাশয় স্বয়ং বন কাটিয়া বালকদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন। অভিভাবকগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মনের ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম তাঁহারা এ হীন কার্য্যে কদাচ নামিবেন না। বরং এই কাটা বন জঙ্গলগুলি পাইলে বাড়ী লইয়া যাইতে পারেন। জ্যেঠামহাশয় বালকদিগকে বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন যে—এই বন জঙ্গল দ্বারা চাষের জমির বেড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। যাহা অতিরিক্ত হইবে তাহা বিক্রয় করিয়া দড়ি ও বাঁশ ক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং অভিভাবকগণের 'কাঠ' করিবার আশা আর রহিল না। এদিকে আমরা বন পরিষ্কার করিতেছি পার্শ্বে জ্যেঠামহাশয় পাঠশালের

ছেলেদিগকে লইয়া বন পরিষ্কার করিতেছেন। যখন দেখিলাম যতগুলি গাছপালা কর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা স্থানান্তরিত করিতে এবং কর্ত্তন করিয়া বেড়ার উপযুক্ত করিতে এবং অবশিষ্ট অংশ জ্বালানি কাষ্ঠরূপে টুক্‌রা টুক্‌রা করিতে আজিকার দিবা শেষ হইবে, তখন আমি বন কাটা ত্যাগ করিয়া, কোদালির সাহায্যে গুল্মলতা প্রভৃতি জঙ্গলের গোড়াগুলি মৃত্তিকা কর্ত্তন করিয়া উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিলাম। যেগুলি ফালের মুখে উঠিয়া যাইবে তাহা তুলিলাম না। জ্যেঠাইমা জ্বালানি কাঠগুলি, লতার সাহায্যে আটী বাঁধিয়া একস্থানে রাখিলেন। বেড়ার খোঁটা ও ঘেরা দিবার উপযুক্তগুলি পৃথক্ পৃথক্ রাখিলেন। সেই দিবস শ্যাম-লতার লতা গুটাইয়া বড় বড় চারি পাঁচ আটি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। পাঁচটার সময় জ্যেঠাইমা ও মা জ্বালানি কাঠের আটিগুলি ও শ্যাম-লতার আটি লইয়া বাড়ী গেলেন। ছেলেদিগকে লইয়া জ্যেঠা-মহাশয় চলিয়া গেলেন। আমি যতখানি জমির বন কাটিয়াছি ততখানি স্থানের স্থূল স্থূল মূলগুলি তুলিয়া তবে গৃহে যাইব মনে মনে স্থির করিয়া একমনে কার্য্য করিতে লাগিলাম।

এখন সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। সূর্য্য অস্ত যায় নাই। আমি আপন মনে কার্য্য করিতেছি। তারাপদ বাবু, আমাদের শ্যামাপদ, জ্যেঠামহাশয় ও পাড়ার অনেকগুলি ভদ্রবেশী ছোটলোক পাঠশালার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্যামাপদ অগ্রেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি মাটি কোপাইতে কোপাইতে বলিলাম—আর একঝাড় আছে শ্যামাপদ? ওটাকে তুলিয়া তোমার

সহিত কথা কহিতেছি। আমি একটু তাড়াতাড়ি কার্য্য আরম্ভ করিলাম। তারাপদ বাবু জ্যেঠার সহিত আমার নিকট আসিতেছেন দেখিয়া একটু ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিলাম। কোদালখানি রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবামাত্র তারাপদ বাবু আমার নিকট আসিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—হারু তোমাদের বাড়ী দেখিয়া আসিলাম, চাষের জমিগুলি অতি সুন্দর করিয়া রাখিয়াছ। আমি তাঁহার কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। তিনি পুনশ্চ বলিলেন—শ্যামাপদ তোমার পড়িবার বইগুলি কেরাসিন বাক্সের ছোট আলমারিতে কেমন সাজান আছে দেখিয়া তোমাকে একটা ছোট আলমারি দিবার জন্য আমাকে বলিয়াছে। যে ঘরখানির দেয়াল তুমি নিজে দিয়াছ সেই ঘরখানিতে সেই আলমারিটী রাখিও। ঐ ঘর, তোমার জ্যেঠামহাশয়, তোমার পড়িবার জন্য স্থির করিয়াছেন। এখন এস তোমার নূতন পুকুর ও জমি দেখি। শ্যামাপদ আমার হাত ধরিয়া চলিল। বন জঙ্গলের মধ্যদিয়া আমরা চলিয়াছি। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ও কি বলাবলি করিতেছে। আমার ও নৈশবিদ্যালয়ের জমি দেখিয়া তারাপদ বাবু জমির পশ্চিমদিকস্থ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার মাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। পাড়ার ছেলে ও পুরুষেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি আমাদের ছোটলোকদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন—তোমরা সকলে যে কার্য্যে হাত দিয়াছ তাহা অতি মহৎ কার্য্য। সকলে মিলিয়া

বিদ্যালয়ের প্রতি যত্ন ও ভক্তি রাখিবে। ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়ে পাঠাইবে এবং নৈশবিদ্যালয়ের যাহাতে উন্নতি হয় তাহাই করিবে। চটের কলে কাজ করিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিও না। তোমরাও এই জমিতে কাজ করিয়া চাষ আবাদের কার্য্য শিক্ষা করিবে। চাষে লক্ষ্মীর শ্রী হয়। মজুরীতে যে কিছুই হয় না, তাহাতো তোমরা হাতে হাতে বুঝিতে পারিয়াছ। তোমাদের পাড়ার একখানি ঘরও হারুদের মত সুন্দর নয়। তাহা আমি দেখিয়া আসিতেছি। সকলেই চাষে মনোযোগী হও, ভবিষ্যতে ভাল হইবে। সমবেত জনগণের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল—হুজুর আমাদের পয়সা কোথায় যে চাষ আবাদ করিব ? তিনি তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—হারুর জ্যেঠা জমি কি করিয়া পাইয়াছে—সেই প্রকারে জমি করিবার চেষ্টা কর ? জমির অভাব হইবে না, টাকারও যোগাড় হইবে। চেষ্টা চাই, ইচ্ছা চাই নচেৎ টাকা ও জমি কি তোমাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইবে ? এইত দেখিলাম তোমরা তাড়ি খাইয়া অদ্যকার দিনটা কেবল হো হো করিয়া কাটাইয়া দিলে ! আর হারু ঐ জমি কতখানা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল, চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া কি শিখিতে পারিতেছ না। তোমাদের পয়সা ব্যয় হইল, সঙ্গে সঙ্গে আজিকার দিনটা বৃথা চলিয়া গেল। এ প্রকারে অর্থের অপব্যয়, সময়ের অপব্যয় করিলে কি টাকা ও জমি হয় ? দশ দিন পড়িয়া থাকিলে কি খাইবে তাহা ভাবিতেছ না। হারুর মা, জ্যেঠাই জমিতে কাজ করিতে পারে, তোমাদের বাড়ীর কি কেহ ঐ প্রকার

কাজ করিতে পারে না ? তোমরা বিনা পরিশ্রমে সুখী হইতে চাও—তা হইতেই পারে না। তোমরা ছুটীর সময় চাষের কাজ কর। কাজ শিক্ষা কর—তবে কৃষক হইতে পারিবে। অল্প জমিতে সংসার চলিয়া যাইবে। চট্‌কলের মাহিনার টাকা ঘরে জমিবে। ক্রমে ক্রমে সুখী হইবে। সমাগত জনগণের মধ্য হইতে এক বৃদ্ধ বলিলেন—হুজুর! পেটের ভাত জমে না—জমি কিনিব কি করিয়া ? চাষ জানিলেও চাষ করিবার উপায় কৈ ? তারাপদ বাবু বলিলেন—দেখিতেছি তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ ; তুমি কি চটকলের মহিমা বুঝিতে পার নাই ? এ পর্য্যন্ত তুমি চট্‌কলে খাটিয়া কি করিলে—দুদিন পরে যখন আর মোটেই কাজ করিতে পারিবে না তখন কি খাইবে তাহা কি ভাবিয়াছ ? টাকা পাইলেই খরচ কর। টাকার সৎব্যবহার কর নাই—নেশায়, খেয়ালে, বাবুগিরীতে টাকা উড়াইয়াছ। এখন ত পেটের ভাত জুটিবেই না। হারুর জ্যেঠামহাশয় ত ঐ চটকলে তোমাদের মতই কাজ করিতেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়াছিলেন তাই এখন সুখী—তুমি ভবিষ্যৎ ভাব নাই; তাই এখন দুঃখ পাইবে। তোমার ছেলেদিগকে তোমার মত দুরবস্থায় ইচ্ছা করিয়া ফেলিতেছ। তুমি বুঝিয়াছ তোমার যৌবনকাল গিয়াছে, বৃদ্ধ হইয়াছ এখন অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তত্রাচ তোমার ছেলেদিগকে, তোমার নিজের অবস্থা বুঝিয়াও ত চটকলের একঘেয়ে কাজ কর্ম্ম ছাড়া আর কিছু শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিলে না—তুমি যে বিষ খাইয়া মরিতেছ—সেই বিষ নিজের হাতে তুলিয়া তোমার ছেলেদিগকে খাওয়াইয়া—তোমার

মত পেটের জ্বালায় মরিবার জন্য শিক্ষা দিতেছ। তোমার আর জ্ঞান কবে হইবে ? এখনও সময় আছে—ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত কর—চাষ আবাদ করিতে শিক্ষা দাও। হারুর মত তাহাদিগকে চাষে খাটিতে শেখাও, তুমিও বাড়ীর মেয়েদিগকে হারুর জ্যেঠামহাশয়ের মত, জ্যেঠাইমার মত খাটিতে শেখাও। দেখিবে দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। তোমরা সকলেই লেখাপড়া শিখ, চাষে খাটিতে ও খাটাইতে শিখ। তোমরা সুখে দিন কাটাইতে পারিবে। তোমাদের দিবা-বিদ্যালয় ও নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য আমি একজন শিক্ষক দিব—তাঁহার মাহিনা ও ভরণপোষণের ভার আমি লইব। তিনি ভাল লোক—হারুদের জমিতে কাজ শিখিবেন এবং তোমাদের বিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন। তোমরা তাঁহার কাজে সাহায্য করিও।

আমি যে মাটিতে দাঁড়াইয়া আছি ইহা আমার পুত্র এই শ্যামা-পদের—শ্যামাপদ, তুমি কি বলিতেছিলে ইহাদের সম্মুখে বল। শ্যামাপদ আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং আমার হাতটি তাহার কোলের নিকট টানিয়া বলিল—আমি আমার ভাই হারুকে আমার পিতৃদত্ত এই জমি হইতে আট বিঘা জমি দিলাম। আমাদের আমিন ও গোমস্তা আসিয়া জমি জরিপ করিয়া সীমানার চিহ্ন দিয়া যাইবে। সেই জমি আবাদ করিতে যত অর্থব্যয় হইবে হারুকে আমার পিতা দিবেন। তারাপদ বাবু বলিলেন "হারু তোমার ভাইএর কথা শুনিলে ত ? আমি তোমার ঐ আট বিঘা জমি আবাদ করিতে যত টাকা ব্যয় হইবে তাহা দিব।"

তাহার পর আমার জ্যেঠামহাশয়ের নিকট যাইয়া শ্যামাপদ বলিল —জ্যেঠামহাশয় আমি আপনার নৈশবিদ্যালয়ের জন্য হারুদাদার মত ছয়বিঘা জমি এই মাঠ হইতেই দিব। সেই জমি আপনারা আবাদ করিয়া—আমার ভাই সকলকে চাষ আবাদ শিক্ষা দিবেন। জ্যেঠামহাশয় পুত্তলিকার মত কথাগুলি শুনিলেন। তারাপদ বাবু পুনশ্চ বলিলেন—তোমরা কৃষি-শিক্ষা করিতেছ—এই প্রকার কার্য্য করিয়া পাঠশালার জমি আবাদ করিতেছ যদি দেখি তাহা হইলে তোমাদিগকে আমি জমি জমা দিব। ছয়মাসের মধ্যে তোমরা যদি এই জমি হারুর জ্যেঠামশায়ের মত হাঁসিল করিয়া আবাদ করিতে পার তাহা হইলে আমি ছয়মাস পরে তোমাদের পরীক্ষা লইয়া খুব কম হারে আরও জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিব। এই সকল জমি তোমাদের জন্যই রাখিয়া দিলাম। এক্ষণে আমি আর কাহাকেও বিলিবন্দোবস্ত করিব না।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে তারাপদ বাবু জমি ত্যাগ করিয়া আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে পাকা রাস্তায় আসিলেন। গ্রামের প্রায় সমুদায় নরনারী, বালকবালিকা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে— তারাপদ বাবুর ঘোড়ার গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন—হারু হাত পা ধুইয়া শীঘ্র এস। আমার সহিত তোমার মার কাছে যাইতে হইবে। তিনি তোমাকে দেখিবেন বলিয়া আমরা তোমাকে লইতে আসিয়াছি। শ্যামাপদ আমার সহিত আমাদের বাড়ী যাইল। হাত পা ধুইয়া কাপড় খানি ঝাড়িয়া পরিয়া চাদরখানি কাঁধে করিয়া বাহির হইলাম।

জ্যেঠামহাশয় নিজের হাতে বোনা নূতন ঝুড়ি করিয়া পেঁপে, আনারস ও একটী বড় মানকচু আনিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। তারাপদ বাবু বলিলেন—ও সব কেন? জ্যেঠা বলিলেন—এসব হারুর হাতে লাগান গাছের ফল। হারু নিজে সার দিয়া মান লাগাইয়াছে। এগুলি খাইতে ভাল তাই হারুর মা হারুর হাতের জিনিষ বলিয়া শ্যামাপদকে দিয়াছেন। শ্যামাপদ আমার হাত ধরিয়া গাড়িতে উঠিল। গাড়ী দৌড়িল। আমার ঘোড়ার গাড়ী চাপা এই প্রথম। পাড়ার সকলে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোলামাবাদের আব্‌হাওয়ার পরিবর্ত্তন

আমাদের ছোটলোকদের পল্লীর বিদ্যালয়টী ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর। ঘরখানিতে দুইটী দরজা আটটী জানালা। পরিষ্কারভাবে লেপা পোছা। চারিদিকে পরচালা ও রোয়াক। দুইখানি 'বোর্ড' আছে। বসিবার জন্য 'সপ' পাতা আছে। ছাত্রেরাই ঘর ঝাঁট দেয়। বিদ্যালয়ের চারি পাশে ফুলের বাগান। ফুলের বাগানের কাজকর্ম্ম ছাত্রেরাই করিয়া থাকে। ছোট ছোট রাস্তা ছাত্রেরাই প্রস্তুত করিয়াছে। রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বে মর্সুমী ফুলের গাছ সারি সারি বিদ্যমান রহিয়াছে। চারিদিকের রোয়াকে—দ্বারদেশ বাদ দিয়া—ছোট ছোট মাদুর পাতা। প্রাতে ও অপরাহ্নে বাগানের কাজ কর্ম্ম হয়। দ্বিপ্রহরে কেতাবী বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অপরাহ্নে ও রবিবার দিবস বাগানের কাজ কর্ম্ম করে। তারাপদ বাবু একজন শিক্ষিত উপযুক্ত যুবক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার নাম সদানন্দ দাস, জাতিতে পোদ (পদ্মরাজ)। তিনি সর্ব্বদা

বিদ্যালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান ও কৃষি-কার্য্য করাইয়া থাকেন। জ্যেঠামহাশয় কৃষি-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং তারাপদ বাবু আমাকে দ্বিতীয় কৃষি-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। জ্যেঠামহাশয় রাত্রে আমাদের পাড়ার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন এবং রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন। পাড়ার অনেক স্ত্রীলোকও রামায়ণ মহাভারত শুনিবার জন্য আসিয়া থাকেন। রামায়ণ মহাভারত পাঠ হইলেও খবরের কাগজ, কৃষি-বিষয়ক, শিল্প-বিষয়ক পুস্তকও পাঠ করেন।

শিক্ষক সদানন্দ দাস মহাশয় স্বয়ং এবং ছাত্রদের সহায়তায় বিদ্যালয়গৃহ হইতে অনেকটা দূরে, একখানি দো-চালা ছিটে-বেড়ার ঘর তুলিয়াছেন—তাহাতে তিনি রন্ধন করেন। রন্ধনের সমুদায় কার্য্যগুলি তাঁহাকে নিজের হাতেই করিতে হয়। ঘর-লেপা, বাটনাবাটা, কুটনাকোটা, জলতোলা প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিয়া তবে রন্ধন ও ভোজন ব্যাপার শেষ করিতে হয়। থালা, ঘটি, বাটিও নিজের হাতে মাজিয়া ঘসিয়া লইতে হয়। মধ্যে মধ্যে আমিও তাঁহার অনেক কাজ করিয়া দিই। বিদ্যালয়ের কৃষি-ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে, চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। বহুবিধ ফসল জন্মিতেছে। আমার কৃষি-ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে। জ্যেঠামহাশয়ের অনুকরণে আমি আমার কৃষি-বিদ্যালয়-ক্ষেত্রটী পরিপাটী করিয়া নানান্ ফসলে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এবার দেশের রুচি অনুসারে—বাজারের বিক্রয়

দেখিয়া কপি, লেটিউস, সালগম, বিবিধ মূলা, আলু, আর্টিচোক প্রভৃতি আবাদ করিয়াছি। আমার পড়িবার ঘরে অনেকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। শ্যামাপদ যে আলমারিটী দিয়াছে তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার ঘরের মধ্যে সপ বিছান আছে। তাহাতে বসিয়াই পড়াশুনা করি। গৃহের এক পার্শ্বে কৃষি-সাধন যন্ত্রাদি সজ্জিত আছে। দেয়ালের গায়ে খোঁটা পুতিয়া তাহাতে তক্তা সাজাইয়া ‘র‍্যাক’ করিয়া লইয়াছি। সেই র‍্যাকে শিশি, বোতলে, ছোট বড় টিনের কৌটায় আমার চাষে উৎপন্ন বিবিধ ফল মূল, তরি তরকারীর বীজ সংগৃহীত রহিয়াছে। শিশির গাত্রস্থ নাম দেখিয়া কোন্‌টিতে কোন্ প্রকার বীজ আছে চিনিয়া লইতে পারা যায়। কোন্ বীজ কোন্ সময়ে বপন করিতে হইবে তাহাও শিশি, বোতলের গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছি। বৎসরের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে কোন্ কোন্ ফসলের জন্য কি প্রকারের জমি প্রস্তুত করিতে হইবে—কোন্ মাসে কি প্রকারে বীজাদি উপ্ত হইবে—কোন্ মাসে কোন্ কোন্ ফসলের বীজ, মূল বা শাখা সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া কাষ্ঠফলকের উপর সংবদ্ধ করিয়া দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। ফসলে কত প্রকার পোকা ও কীট লাগিয়া অনিষ্ট করিতে পারে—তাহার সুরঞ্জিত ছবি বাঁধাইয়া তারাপদ বাবু আমাকে দিয়াছেন। সেইগুলি বারান্দার চারিদিকে সাজান রহিয়াছে। বিলাতী ও দেশী বহুবিধ ফসলের সুরঞ্জিত সুস্পষ্ট প্রায় চল্লিশখানি চিত্র শ্যামাপদ আমাকে দিয়াছে। আমি

সেইগুলি মানচিত্রের মত ঘরের ভিতরে বাহিরে সাজাইয়া রাখিয়াছি। তারাপদ বাবুর প্রদত্ত কৃষিবিষয়ক অনেকগুলি পুস্তক আমার পাঠাগারে আছে। আমার এই পড়িবার ঘরটী বিদ্যা-লয়ের পুস্তকালয়রূপে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষক সদানন্দ মহাশয় কৃষিবিষয়ক পুস্তকগুলিতে বিশেষ পণ্ডিত; কিন্তু আমাদের মত হাতে কলমে তিনি কৃষি আদৌ করিতে পারেন না। আমি তাঁহার নিকট কৃষিবিষয়ক নূতন কথা শিখিতাম। তন্মধ্যে আমাদের দেশের উপযোগী ভাবে যাহা কাজে লাগাইতে পারিতাম তাহারই চেষ্টা করিতাম। অনেক নূতন নূতন শাক, সব্জী ও ফলের এবং বিবিধ মূলের সন্ধান পাইয়া, চিত্রে উহাদের আকারগত, গঠনগত সমুদায় বিষয় বিশদ্ভাবে দেখিয়া আমি উহাদের ব্যবহার শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার কৃষিক্ষেত্রে উহারা শোভাবর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার ইচ্ছা বাগানের তিলমাত্র ভূমি যেন বৃথা পড়িয়া না থাকে। আমি এ বৎসর তিন প্রকার তামাকের কৃষি আরম্ভ করিয়াছি। দিদি চটের কলের কাজ ছাড়িয়া দিয়া আমার ক্ষেত্রে কাজ করেন। তাঁহার সাহায্যে আমার কৃষিবিদ্যালয় উন্নত হইতেছে—পাড়ার স্ত্রীলো-কেরা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতে শিক্ষা করিতেছে। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে দৈনিক বেতন দিয়া আমরা অনেক কাজ করিয়া লই। যাঁহারা চটকলে কাজ করেন তাঁহারাও রবিবার দিবস আমাদের ক্ষেত্রে কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যে রমণীগণের যতদূর অভিজ্ঞতালাভের প্রয়োজন তাহা

বালক কেবল খেলা করিয়া বেড়াইত, তাহারা লেখাপড়া শিক্ষার সহিত চাষের কাজ, দড়ি পাকান, কাঠের পুতুল গড়া এবং হাটে বাজারে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে শিখিয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও কাঠের পুতুল প্রস্তুত ও পুতুলে রং ফলাইতে শিক্ষা করিয়া একটা উপার্জ্জনের পথ পাইয়াছে। সম্প্রতি শিক্ষক মহাশয়, কাঠ কুঁদিবার অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন এবং কাঠের গায়ে রঙ্গিণ গালার রং ধরাণ শিক্ষা দিবার জন্য, বিবিধ বর্ণের গালার বাতী প্রস্তুত-প্রণালী আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কুঁদ-যন্ত্র ঠিক করিয়া, আমাদিগকে দড়ির সাহায্যে টানিতে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি স্বয়ং, আকাঠা, কুকাঠা হইতে ছেলেদের চুষীকাটী, রাখাল-লাঠি, লাট্টু, কাঠের ছোট ছোট 'বল' প্রস্তুত করিয়া, আমাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কুঁদ-যন্ত্রের নিকট কেমন করিয়া বসিতে হয়, কেমন করিয়া কাঠ সংযোগ করিতে হয়, কেমন করিয়া কুঁদিবার জন্য লৌহ বাটালি ধরিতে হয়, কেমন করিয়া কোথায় চাপিয়া ধরিতে হয়, কোথায় আল্গা দিতে হয়, কোন্ যন্ত্রের পর কোন্ যন্ত্রের ব্যবহার করিলে কি রকম খোদাই কার্য্য হয়, তাহা তিনি হাত ধরিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হুঁকার নলিচা, তুলাদণ্ড, প্রভৃতির কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে হইতেছে। চুষী কাটী, ঝুমঝুমী, রাখাললাঠি, লাটিম প্রভৃতির গায়ে, রঙ্গিণ গালার বাতী দিয়া কুঁদ-যন্ত্রের সাহায্যে, কাদৃশভাবে রঞ্জিত করিতে হয়, তাহারও শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয়ের মধ্যেই, কেতাবী পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে,

অনেকগুলি অন্ন-সংস্থান-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই, ঐ সকল বিক্রয় করিতে হাটে, বাজারে ও মেলায় গমন করে। চাষের জমির জন্য, কয়েকজন প্রতিবেশী তারাপদ বাবুর নিকট গিয়া আবেদন করিয়াছিল। তিনি প্রত্যেককে চারি-বিঘা করিয়া জমি দিয়াছেন। তিনি এরূপ প্রথায় জমি দিয়াছেন যে—ভবিষ্যতে পাশাপাশি ভাবে ও দীর্ঘে, অনেক জমি পাইতে পারিবে। অথচ বেড়া দিয়া, জমি ঘিরিবার খরচ খুব কম পড়িবে। পাশাপাশি সকলের জমি, দুই পাশে যাহাদের জমি, তাহাদিগকে জমির তিনদিক এবং মধ্যে যাহাদের জমি, তাহাদের দুইদিক ঘিরিতে হইবে। মধ্যের জমিতে দুই জন রমণীর জমি ছিল।

আমার বিদ্যালয়ের ইংরাজি পড়া, সদানন্দ দাস বলিয়া দেন। নৈশবিদ্যালয়ের কার্য্য সমাধা হইলে, যখন তিনি রন্ধন কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার নিকট বসিয়া, আমি পড়ি। তাঁহার বাটনা বাঁটিয়া দিই। পুকুর হইতে জল তুলিয়া আনি। তিনি আমাকে পড়ান। স্কুলের পড়ার মধ্যে, কেবল মুখস্থ করিতে হয়। মুখস্থ ছাড়া আর কোন কৃতিত্ব দেখাইবার উপায় নাই। ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ সকলি মুখস্থ। আমি ভাবি, পাখীর মত মুখস্থ করি কিন্তু ভূগোল, ইতিহাস পাঠের স্বার্থকতা কিছুই বুঝিতে পারি না। আলুর চাষ করি, বুদ্ধি খাটাই, সঙ্গে সঙ্গে ফল দেখিতে পাই। কেতাবী বিদ্যায়, হৃদয় অবশ হইয়া পড়ে, স্ফূর্ত্তি আদৌ পাই না। হাতে হাতে ফলও দেখিতে পাই না। পড়াটী এক-রকম মুখস্থ করিয়াই খালাস—নিজের বুদ্ধি চালাইতে সুযোগ

পাই না। স্কুলের কাজ, পড়া সকলি কলের মত টিপ্‌নিতে চলিয়াছে। শৃঙ্খলা আছে, কেতা দুরস্ত আছে কিন্তু মানুষ গড়িয়া উঠিবে কিনা বলিতে পারি না। আমার মনে হয়, আমাদের মত ছোটলোকদের, আমাদের মত গরীবদের পক্ষে, স্কুলের কেতাবী বিদ্যা, আদৌ সুফল প্রসব করিবে না। আমরা গোলামী করি, গোলামের জাতি, আমাদিগকে কেতাবী বিদ্যা পড়াইয়া, ভদ্র-গোলাম করা সহজ কথা। আমি গোলাম হইতে চাই না। আমার ঘোষেদের রাখালী-যুগের গোলামীর কথা, মনে পড়িয়া আকুল করিয়া তুলে। আমাদের স্কুলের সমপাঠীদের মধ্যে শুনিতে পাই, তাহাদের পিতা বা আত্মীয়গণ, আফিসে চাকরী করেন। তাঁহারাও আমাদের মত, স্কুলের কেতাবী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, গোলামী করিতেছেন! ওঃ কি ভীষণ কথা—গোলামী করিবার জন্য লেখা-পড়া শিক্ষাও কি আমরা করিতেছি? অনেকের ইচ্ছা স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়া চাকরী করিবে! একদিন শ্যামাপদকে বলিয়াছিলাম হাঁহে! এরা সব বলে কি? স্কুলের পড়া শেষ করিয়া, গোলামী করিবে! এত পরিশ্রম করিয়া, মুখস্থ করিয়া, স্কুলে পড়িয়া, কি না গোলাম হইবে! ঘোষেদের মত মনিব যদি পায়, তবেই আক্কেল হইবে। শ্যামাপদ বলিয়াছিল—তোমার ঘোষেদের মত মনিব প্রায় সকল চাকুরে বাবুদের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে। এই চটকলের সাহেবটী, তোমার ঘোষ-মনিবের মত। চটকলেও ভদ্র কেতাবী বিদ্যায় শিক্ষিত গোলাম আছে—তাঁহারা বাঙ্গালী। তাঁহাদের ভাগ্যে, মাঝে মাঝে, তোমার সেই মাথা কাটার মত অভিনয় হয়।

সেদিন একজনকে চাব্‌কে লাল করে দিয়েছিল। চটকলের সকলেই, সাহেবকে "জুডাস্ ইস্‌কেরিয়ট" নাম দিয়াছে। আমি শ্যামাপদকে বলিলাম—ও নামটি কি তাঁহার প্রকৃত নাম নয়? —না, ইনি পূর্ব্বে এই চটকলের ম্যানেজারের নিম্নে চাকুরী করিতেন। লোকে বলে, ইঁহার স্বভাব ভাল নহে। পূর্ব্বে যিনি চটকলের ম্যানেজার ছিলেন, তাঁহার পত্নী, ইঁহাকে স্নেহ করিতেন। তাঁহার পত্নী ও ইনি যোগ করিয়া, আপন প্রভুকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলেন। সেটা খুব গোপনে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর কয়েকমাস পরে, প্রভুপত্নীর সহিত, ইহাঁর নিকা হয়। সেই সময় হইতে, সহরের ভদ্রলোক, এই সাহেবকে "জুডাস্ ইস্‌কেরিয়ট" বলিয়া সম্বোধন করে। পূর্ব্ব ম্যানেজারের, এই চটকলে বড় একটা অংশ ছিল। এখন সেই অংশ, জুডাস্ ইস্‌কেরিয়ট সাহেবের হইয়াছে।

শ্যামাপদ, কৃষ্ণপদ, ও আমার মুসলমান বন্ধুটীর কিন্তু চাকরী করিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া, কোন ব্যবসা করিবেন। আমি বলিলাম—লেখাপড়া শিক্ষা যেমন কষ্টসাধ্য ব্যবসা শিক্ষা তদপেক্ষা কঠিন। সঙ্গে সঙ্গে দুইটা শিখিতে না পারিলে—একটা শিক্ষার পর, শেষে কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া ব্যবসা বা কৃষির প্রথম ভাগ পড়িয়া, উপযুক্ত শিক্ষালাভ সম্ভব হইবে না। সেই জন্যই বোধ হয় অনেকে অকৃতকার্য্য হইয়া, শেষে গোলামীই গ্রহণ করে। আর আমার বোধ হয়, প্রকারান্তরে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে অজ্ঞ রাখিয়া,

গোলামীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশেই দুইটী বিদ্যা একত্রে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। একটী সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা, অপরটী অন্নসংস্থান বিদ্যা শিক্ষা। কেবল আজন্ম সাধারণ বিদ্যালয়ের কেতাবী শিক্ষা করিয়া, নিৰ্জ্জীব ও বাবু হইয়া পড়িলে, শেষে কয়জন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার সুযোগ পাইবে! আর এতদূর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা কি সম্ভব? বিশেষ আমাদের বাঙ্গালীর অন্নচিন্তা চমৎকার! সুখে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া, শেষে চাষে, শিল্পে বাণিজ্যে খাটিয়া শিক্ষা করাটা তাদের পক্ষে "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" বলিয়াই মনে হইবে। এক দিকে বিজ্ঞ হয় এবং কৃষি, শিল্পে বাণিজ্যে অজ্ঞ হইয়া থাকে। ছোট-লোকদের নিকট, কৃষক, শিল্পী ও দোকানদারগণের নিকট, তাঁহা-দের অজ্ঞতা গোপন রাখিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হয়। ছোট-লোক চাষা, মুটে মজুরদের বুদ্ধির কাছে হার মানিতে, তাহাদের নিকট শিক্ষা করিতে, কি কেরাণী দিগ্‌গজগণ চাহিবেন! এ অপমান, তাঁহাদের সহ্যই হইবে না। সুতরাং তাঁহারা, কেরাণীগিরী, গোলামী-গিরী করিবেনই করিবেন! যদি কেহ জোর করিয়া চাষে, শিল্পে, বাণিজ্যে হাত দেন—ঐ ঐ বিষয়ে ধুরন্ধরগণকে, তাঁহারা নীচ ভাবেন—তাঁহাদের সমকক্ষ ভাবেন না। সুতরাং বেজায় ঠকিয়া, বেজায় নাকাল হইয়া, দেনার দায়ে গোলামী করিতে আরম্ভ করেন। তাই মনে হয়, স্কুলগুলি গোলামী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যতদিন গোলামের খুব দরকার থাকিবে, ততদিন এই স্কুলগুলি বর্ত্তমান প্রথায় চলিবে। যখন গোলামের

আবশ্যকতা কমিবে, তখন এই স্কুলেই অন্নসংস্থান বিদ্যার সহিত, কেতাবী বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে।

আমাদের ছোটলোকদের পাড়ায়, নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে—গোলামের জাতি, গোলামীকার্য্যের নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। গোলামের জাতি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। নূতন চোখে পৃথিবী দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিক্ষক সদানন্দ দাস মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন—আমাদের ন্যায় পতিত জাতির মধ্যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা, বহুদিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ধোঁকায় পড়িয়া, ভদ্রলোকের অনুকরণ করিতে গিয়া, বিষম ঠকিয়াছি। আমাদের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন কৃষক। কৃষিকার্য্য, শিল্প ও ব্যবসা করিয়াই আমাদের পিতা পিতামহগণ, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তত্রাচ, আমাদের জাতির অনেকেই গোলামী করিতেন। ভদ্র লোকে, আমাদিগকে পতিত, অপবিত্র জাতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আমাদের জাতিরা, তাঁহাদের ছেলেদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। কি জন্য পাঠাইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি—তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আমাদের ছেলেদিগকে ভদ্র-লোক করিয়া তুলিব—ভদ্র লোকের মত, অফিসের কেরাণী বা বড় বাবু হইতে পারিবেন। আমাদের মত, হাতে, পায়ে খাটিতে হইবে না। দু দশটা ইংরাজী বুক্‌নী, কথায় কথায় বলিবে। ভদ্রলোক সাজিয়া বেড়াইবে। চাষে খাটা, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, ছুতারের কাজ, দোকান করা, হাটে পথে বিক্রয় করা ভদ্রলোকের কাজ নহে—

ওসব ছোটলোকের কাজ, মজুরের কাজ। ধীরে ধীরে, আমাদের মধ্যে, সকল অন্নসংস্থানের প্রকৃষ্ট পন্থাগুলি বর্জ্জন করিতে হইল। সকলেই ভদ্র, সকলেই বাবু হইবে। কাজেই স্কুলের কেতাবী বিদ্যাটা, আমাদিগকে ভবিষ্যৎ দারিদ্রতার দিকে, ভবিষ্যৎ ধ্বংসের দিকে, লইয়া চলিল। গোলামীটা, একটা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, আমাদের সমাজে প্রবেশ করিল। সুতরাং আমাদের ছোটলোক ভ্রাতাগণ, নরকের এ দ্বার ত্যাগ করিয়া, অপর দ্বার দিয়া. নরকেই প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রকমের কেতাবী বিদ্যাবিদ্ বাবুগণই, সমাজের মাথায় মুগুর মারিলেন। আমাদের জাতির মধ্যে সকলেই, কেরাণী বাবু হইতে চলিয়াছে। চাষ, আবাদ ছাড়িয়াছে। শিল্প, বাণিজ্য ছাড়িয়াছে। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, কেবল কেতাবী বাবুদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, সমাজের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। এখন সমাজ সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের সমগ্র বাঙ্গালা ব্যাপিয়া, একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। সকল জাতীয় মানবের মধ্যে আত্ম-জাগরণ দেখা দিয়াছে। কেতাবী বিদ্যার মহিমা, অনেকে বুঝিয়াছে। তত্রাচ, পল্লীতে পল্লীতে, এখন কৃষিবিদ্যালয়ের সহিত, কেতাবী বিদ্যার মিলন হইতেছে না। এখন আমরা, মেষপালের মত, ছেলেদিগকে কেতাবী বিদ্যায় দক্ষ হইবার জন্য, কেতাবী বিদ্যালয়েই পাঠাই-তেছি। যখন গোলামীর উমেদারীতে, চাক্‌রীর বাজার পূর্ণ হইয়া যাইবে, যখন তাহারা, দুষ্ট ছেলেদের মত, চাকরী না পাইয়া, গোলমাল, হুটোপাটী আরম্ভ করিবে, তখন

দেখিতে পাইবে, গোলাম তৈয়ারির কারখানাগুলি, ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। দেশের লোকে, দেশের অন্নসংস্থানের উপযুক্ত, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যালয়ের সহিত কেতাবী বিদ্যালয়ের যোগ করিয়া; একপ্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবে। সেই বিদ্যালয়ের মত আদর্শ-পাঠশালা, আমাদের এইটি। এইটিই, আমাদের প্রকৃত জাতীয় সম্পত্তি—এইটি যখন কালক্রমে বড় হইবে, তখন দেখিবে, আমাদের দেশ উন্নত হইয়া গিয়াছে। কলির ফেরেব-বাজী, সয়তানের সয়তানী ফন্দী, মন্দীভূত হইয়া যাইবে। জুডাস ইস্-কেরিয়টের চটের কলে, ছোটলোক কুলী আর পা দিবে না। ভদ্র কুলী, উদর জ্বালায় তথায় প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের ছোটলোকগুলি, প্রকৃত শিক্ষা, দীক্ষায় দেশের মধ্যে, কুবেরালয় প্রতিষ্ঠা করিবে। লক্ষ্মীর বরপুত্র হইবে।

সদানন্দ বলিয়াছিলেন—দেখ হারু! আজ কাল, বঙ্গের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক উন্নতির ঢেউ উঠিয়াছে, এটা মন্দ নয়! যদি সত্য সত্যই সেইভাবে বিভোর হইতে পারি, তাহা হইলে ত কথাই নাই। সে রকম লোক, কটা পাওয়া যায়? সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ জুতা, জামা, টেরি, ঘড়ি, ছড়ি সিল্কের চাদর যেমন কায়দামাফিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আজকাল সেইরকম যোগসাধনা, আশ্রম-প্রতিষ্ঠা, স্বামিজী হওয়ারও নূতন ফ্যাসান হইয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের দলে কেহ কেহ, কীর্ত্তন করিতে করিতে দশা পাইতেছে—বাবাজী হইয়া পড়িতে সাধ অনেক নিষ্কর্ম্মা ধূর্ত্ত প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক শঠ, লম্পট অর্থ উপার্জ্জনের

জন্য, পঞ্চানন্দের সেবাইত হইয়া দশা পাইতেছে। দশার ঘোরে, বন্ধ্যাকে পুত্রবতী হইবার ঔষধ দিতেছে। অপহৃত দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্তির কথা বলিয়া দিতেছে। এ সবই ভণ্ডামি! কলিকাতার ছাত্রাবাসে যখন থাকিতাম, তখন আমি অনেক যুবক ছাত্রকে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতে দেখিয়াছি। কেহ ধ্যানবলে কর্ণ নাড়িতে, কেহ গাত্র চর্ম্মের পশুবৎ আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে বলিয়া গর্ব্ব করিত। অনেকেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান গণনা করিতে পারে বলিত। কেহ কেহ গুহ্যদ্বার দিয়া পেটের নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া, কলের জলে ধুইয়া পরিষ্কার করে। কেহ কেহ, বিছানায় বসিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত আলাপ করেন। আমার মনে হয়, এসব ভণ্ডামি, বুজরকি আজকালকার ভদ্র-সভ্যগণের, একটা ফ্যাসান হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে হাতের মুষ্টি হইতে, আতর, গোলাপজল টপ্ টপ্ করিয়া ফেলিতে পারেন। হারু! এসব কি ভণ্ডামি নয়? হয় কি না হয়—তাহা ভগবান অবগত আছেন! সাধু যোগীরা, এসব ভণ্ডামি কি করেন? যারা ভণ্ড, জুয়াচোর, তাহারা ভণ্ডামি দ্বারা লোক ভুলাইয়া, স্বামিজী সাজিয়া, রাতারাতী একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, তারকেশ্বরের মোহন্তের মত, জমিদার-সন্ন্যাসী বা ফকির হইতে ইচ্ছা করেন।

বাবুগিরী করিবার মত চাকুরী মিলে না। বিলাসিতার জন্য অর্থ সংগ্রহ হয় না। যোগসাধন দ্বারা প্রচুর খাদ্য, যথেষ্ট বাবুগিরী, অগাধ ধনের অধিকার লাভ হইয়া থাকে—তাহাদের গুরুগণ বলেন—মারণ, উচাটন, বশীকরণ দ্বারা বিশ্বটাকে হাতের মুঠার

মধ্যে আনা যায়। যোগী হইবার সাধ, যুবকগণের ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কায়দা, বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৌদ্ধযুগের শেষদশায়, যুবক শ্রমণগণের মধ্যে, এই রকমের একটা ভাব, জাগিয়া উঠিয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক পাঠে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর একবার, এই বঙ্গেই—শিক্ষিত, সভ্য, অসভ্য সকল সমাজেই, এইরকম শব-সাধনা, মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতির ঘোর তরঙ্গ উঠিয়াছিল—কারণাম্বুতে সকলেই উন্মত্ত হইয়াছিল। সেটা মুসলমান বাদশাহী যুগে, যখন স্বাধীনতার নাম গন্ধ ছিল না। হিন্দুর একটুও ভণ্ডামি করিবার উপায় ছিল না। ধর্ম্মযাজকগণের উপর, ব্রাহ্মণগণের উপর, যখন মোসলেম শাসনকর্ত্তাদের তীব্র দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, যখন আমরা, বলে বা কৌশলে মোসলমানদিগকে আদৌ কায়দা করিতে পারিলাম না, তখন কত প্রকার জপ, জাপ, মন্ত্র, ধ্যান, মারণ, উচাটন, পিশাচ-সাধন, ডাকিনী-সাধন ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছিল। ফলে, তখন ভদ্র, সভ্য, শ্রেষ্ঠ জাতিগণের সভ্যতার ও বিদ্যার কায়দা—ঐসব হইয়াছিল। ফলে কিছুই হইয়া উঠে নাই। অধিকাংশই ফাঁকি। সন্ন্যাস, ত্যাগ, যোগ-সাধনা, তপস্যা যদি এত সহজে লাভ হইত—বাবুগিরীর মধ্যে কুড়াইয়া পাওয়া যাইত—তাহা হইলে, সংসার এত দিনে স্বর্গে চলিয়া যাইত। সকলেই হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিত। ছ-কড়া ন-কড়ায় হাটে বাজারে ফেরি করিয়া বিক্রয় হইত! কেহ কেহ হয় ত 'সাচ্চা' থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশই

মেকি। সাচ্চা যে নাই তা নয়। মেকির আড়ম্বর বেজায়, সব লোক দেখান! ঈশ্বর সাধনা, যদি এত সহজ হইত, তাঁহার দর্শনলাভ যদি হাসিতে হাসিতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে পাওয়া যাইত, এতদিন ঈশ্বরকে, লোকে কাঁচের খাঁচায় পুরিয়া ফেলিত। বর্ত্তমান যুগে, আমাদের কেতাবী পড়ুয়ারা, প্রায় সকলেই যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। সকলেরই 'দশা' পাইবার মত হইয়াছে। অনেকের দশাও পাইতে দেখিয়াছি। প্রেততত্ত্ব—সম্মোহন ও ভূতাবির্ভাব দ্বারা, অনেকে উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। হারু, বলিতে কি, আমার নিকট ওসকল ধর্ম্মের সোপান বলিয়া মনে হয় না। আমাকে এক স্বামিজী পাইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার শিষ্য করিবেন বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে আমি, তাঁহাদের হাত ছাড়াইয়া বাঁচিয়া গিয়াছি। আমাদের ছোটলোকদের মধ্যে, অনেকে 'দেয়াসীন্' হইয়াছে—অনেকে হইবে হইবে হইয়া উঠিয়াছে। যাই হউক, 'দশায় পড়া' এবং আদেশ পাওয়ার হুজুগ, এখন বাঙ্গলার মধ্যে কমে নাই—বরং বাড়িতেছে। এ সকল কমিতে, আমাদের অবস্থার উন্নতি হইতে, কত দেরী তাহা গণিয়া ঠিক করিতে পারি নাই।

আমাদের উন্নতির মধ্যে দেখিতেছি, ছুৎমার্গের মাত্রা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এখন সমুদ্রযাত্রা নিষেধ লইয়া, ছুৎমার্গীর দল মাথা পাকাইতেছেন। দেশটাকে সমাজটাকে একেবারে পচাইয়া তুলিয়াও তাঁহাদের সাধ মিটে নাই। সমাজের গলায় দড়ি দিয়া এত জোরে কশিয়া বাঁধিয়াছে যে, সমাজের উদ্বন্ধনে মরিবার উপক্রম

হইয়াছে। হারু, গোলামের জাতিকে, তাঁহারাই জুতার তলায় চাপিয়া রাখিতে চাহেন। বহুকাল লেখাপড়াটা, তাঁহাদের মধ্যে একচেটিয়া রাখিয়া শাস্ত্রের গাত্রে কত রক্তপাত, কত কলঙ্ক, কত নীচতার প্রলেপ দিয়া—তাঁহারা গোলামের দলকে কুকুরের মত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে, সে সব কারসাজি আর বড় ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে আবদ্ধ নাই। বিদ্যা সাধারণের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তাই রক্ষা! নতুবা দেশটা ডুবিতে বাকি থাকিত না। এখন আর বিদ্যাটা কাহারও একচেটীয়া নাই—অবাধ বাণিজ্যনীতির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। হারু, দেশটা রক্ষার নামে যে ধর্ম্মগুরুগণ নষ্ট করিতেছিলেন, অনেক স্থলে তাঁহারা আর হাত চাপিয়া ধরিতে পারিতেছেন না। সব ফাঁক হইয়া যাইতেছে। এখন বিদ্যাকে—কেতাবী বিদ্যাকে, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের মধ্য দিয়া, উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেই হইবে। ঈশ্বরের কৃপায়, দেশটা উন্নত হইবে। ছোটলোকগুলার ভিতর বিদ্যা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য দ্বারা স্বদেশ-প্রেম, স্বদেশ-সেবা ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে। কু-শিক্ষার ফলে, শিক্ষিত সমাজে, ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে—অভাব বশতই তাঁহারা জালিয়াৎ, প্রবঞ্চক, চোর, ডাকাত, নরঘাতক হইয়া উঠিতেছেন। আমাদের মধ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং কেতাবী বিদ্যার ফলে, দিন দিন অভাব মোচন হইবে। আমাদের মধ্যে অপরাধ কমিয়া যাইবে। আমাদের মানের কান্না নাই—আমরা চাষ করিব, জাল বুনিব, ছুতারের, কামারের কাজ করিব। হাটে বাজারে মেলায় পণ্য-দ্রব্য মাথায়

রাখিয়াছি। সে ঘর খানি কৃষিবিষয়ক চিত্রে, যন্ত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন আমি আমাদের নৈশ ও দিবা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে লইয়া হাটে, বাজারে কৃষি-উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিতে যাই। জ্যেঠাইমা ও মা এখন চটকলে কাজ করেন না; তাঁহারা কৃষিক্ষেত্রের কাজেই অবকাশ পান না।

সদানন্দ দাস ও আমি নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াই এবং নৈশবিদ্যালয়ের দুইটী ছাত্রও এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছে। যে গৃহে প্রথম নৈশ বিদ্যালয় হইত, সে গৃহটী এখন পাঠাগারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র একখানি সুবৃহৎ টীনের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা চারিটী কুঠুরিতে বিভক্ত। নৈশ-বিদ্যালয়টী এখন বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, বোর্ড ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছে। পৃথক্ একটী বৃহৎ টীনের ঘরে ছুতারমিস্ত্রীর কারখানা হইয়াছে। করাত, বাটালি প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রে কারখানার যন্ত্রাগার পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার কামার জ্যেঠার ছেলে বিশ্বনাথ দাদা, আমাদের বিদ্যালয়ের পার্শ্বে 'কর্ম্মকার-শালা' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারখানার সমুদায় ব্যয় তারাপদ বাবু দিয়াছেন। কর্ম্মশালায় চারিটা হাপোর আছে। পাঠশালার দ্বাদশটী যুবক তথায় কর্ম্মী হইয়াছে। স্কুলের টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই প্রস্তুত করিয়াছে। আমাদের পাঠশালাটী, এখন পাঠশালা নাই। স্কুল বা কলেজের ধরণে কাজ হইতেছে। পৃথক্ তিনখানি সুবৃহৎ গৃহে কৃষি-বিদ্যালয়ের কাজ হয়। এক্ষণে বিদ্যালয়ের একশত বিঘা

জমিতে কৃষিকার্য্য হয়। কুড়ি বিঘা জমিতে ফল ফুলের বাগান হইয়াছে।

বেতন দিয়া পড়িবার উপযুক্ত ছাত্র একশত এবং অবৈতনিক ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশ হইয়াছে, ছাত্রাবাসের জন্য দুইটী বড় বড়, মৃত্তিকার দেয়াল দিয়া খড়ের ছাউনী ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে ছোট ছোট তক্তাপোষ চল্লিশখানি পাতা আছে। চল্লিশটী ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকিতে পারে। তাহারা তাহাদের বস্ত্র পরিষ্কার, রন্ধন, গৃহ পরিষ্কার কার্য্য নিজেরাই পালাক্রমে করিয়া থাকে। মাসিক পাঁচ টাকার মধ্যে তাহাদের সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। তাহারা বিদ্যালয়ে ছুতারের, কামারের ও চাষের কার্য্য করে। সকল বালককেই অন্নসংস্থানের উপযোগী কোন একটী কার্য্য করিতে হয়। শিক্ষিত ছাত্রগণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা মাসিক প্রায় তিন চার টাকা উপার্জ্জন করে। সুতরাং গৃহ হইতে কোন মাসে দুই টাকা কোন মাসে এক টাকা আনিতে হয়। ভবিষ্যতে তাহাদিগকে এই টাকা কয়টী যাহাতে বাড়ী হইতে আনিতে না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

আমাদের পাড়ার কয়েকটী বৃদ্ধ ছাড়া, আর এক্ষণে কেহই চটকলে কাজ করে না। সকলেই কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছে। কাঠের কাজ অনেকেই শিক্ষা করিতেছে—চাষ ও শিল্প এবং বাণিজ্য দ্বারা আমাদের পাড়ার সকলেই বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ছোটলোকদের পাড়াটী উন্নত হইয়াছে—আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অন্যান্য স্থান হইতে আমাদের

পল্লীর আত্মীয়-কুটুম্বগণ আসিয়া বাসকরিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের পল্লীতে মুদিখানার দোকান, কাপড়ের দোকান, পাড়ার লোকেই করিয়াছে। মাছ ও তরিতরকারী প্রায় কাহাকেও ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হয় না। হলুদ, আদা, লঙ্কা, পেঁয়াজ প্রভৃতি আমাদের পল্লীবাসীরাই সহরে যোগাইতেছে। পাড়াতে একটী 'পুতুল-নাচের' দল হইয়াছে। খেজুরের রস এখন মাদকদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত না হইয়া গুড় প্রস্তুত হইতেছে।

চট্‌কলে কেবল যে আমাদের পাড়ার ছোট লোকেরাই কাজ করিত তাহা নহে। অন্যস্থানে ও চট্‌কলের নিকটে গোলামাবাদ আছে। তথা হইতে যথেষ্ট ছাত্র আমাদের বিদ্যালয়ে আসিতেছে। আমাদের পল্লীর রাস্তা ঘাট পরিষ্কার—পয়ঃপ্রণালী আমরা দেখিয়া শুনিয়া পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। তুই ঘর মেহতর ও তুই ঘর ডোম আসিয়াছে। তাহাদিগকে আমরা চাঁদা করিয়া বেতন দিই। এতদ্ব্যতীত তাহাদের উপরি পাওনা হয়। আমাদের কারখানা হইতে সাতটী আলোকস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া পল্লীর বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। উহার ব্যয়ভার, আমাদের স্কুল হইতে তিনটীর ও পল্লী হইতে চারিটীর যোগান হয়। চার পাঁচটী পুষ্করিণী পরিষ্কৃত ও যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য গোলামাবাদের কুলীরা কৃষি, শিল্পে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়াছে। আমাদের মধ্যেই 'ফেরিওয়ালা' হইয়াছে।

আমাদের পল্লীটী তারাপদ বাবুর জমিদারী। তিনি প্রজাগণের সুখসচ্ছন্দতা ও উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন।

শনি ও রবিবারে তিনি পল্লীপর্য্যবেক্ষণে বহির্গত হন। শ্যামাপদ রবিবার, নৈশ ও দিবা বিত্থালয়ে, শিক্ষকতার কার্য্য করেন। মহম্মদের চেষ্টায়, অনেকগুলি মুসলমান ছাত্র আমাদের বিত্থালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছাত্রাবাসে অবস্থান করে।

ছোটলোকদের মধ্যে শিক্ষায় আগ্রহ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম আমাদের জাতির মধ্যে বুঝি লেখাপড়া জানা লোক আদৌ নাই। এখন দেখিতে পাইতেছি, উকিল, মোক্তার, কেরাণী, গোমস্তা, আটপ্রহরী, গোলাম, কুলী, কৃষক, ব্যবসাদার সবই আছে। তাঁহারা খুব বাবু, আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যধিক করেন। নিজেদের অভাবে নিজেরাই ডুবিয়া আছেন। তাঁহারা নিজেদের জাতির পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। স্বজাতির সহিত আদৌ মিলিতে মিশিতে চাহেন না। তাঁহাদের ছেলেরা খুব বাবু। স্কুলে পড়েন, কলেজে পড়েন, চুরুট খান, থিয়েটার দেখেন, তাস খেলেন। চাষ, শিল্প ছোটলোকের কাজ বলিয়া, তাঁহারা আদৌ তাহার সীমানায় প্রবেশ করেন না। আমাদের ছোটলোকের জাতি, একটু লেখা পড়ার কেতাবী শিক্ষার ফলে, গোলামী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ভদ্রতা বজায় রাখিতে, অতিরিক্ত বাবুগিরীতে বিশটাকা খরচ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন। তাঁহারা যে আমাদের ছোটলোকের জাতি, গোলামের বংশধর—চাষার ছেলে একথা আদৌ মনে করেন না। আমাদের পতিত হীন

জাতিকে ত্যাগ করিয়া আমাদের মধ্যে যদি কেহ ভদ্র ও উন্নত জাতিতে উঠিতে চেষ্টা করেন—আপনার মনে আপনি যদি ছোট-লোকের জাতি হইতে রাতারাতি বড়জাতি, শ্রেষ্ঠ সভ্যজাতি হইতে যান—তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠগণ হাস্য করিবেন—আমরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া কুলাঙ্গার বলিব। সমগ্র জাতীয় উন্নতি বিধানে যত্নবান না হইলে অঙ্গুলী পর্ব্বে গণিত দুই চারি জনের কেতাবী উন্নতিতে, সমাজের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিক সাধিত হইবে। তাঁহাদের চাল চলন, হাব ভাব দেখিয়া দুঃখই হইয়া থাকে। আমাদের জাতির মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত হইয়া পাঠশালা খুলিয়াছেন—আমাদের ছোটলোকের ছেলেরা তথায় পড়ে। না আছে পণ্ডিতের বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি। ছেলেদের মাথাটা ভক্ষণ করিবার জন্য, নিজে দু টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাবুগিরী করিবার জন্য, তাঁহারা এই প্রকার লোক ভুলান ছেলে ধরার ফাঁদ পাতিয়াছেন। ভদ্র সভ্য জাতির যুবক বা প্রৌঢ়গণ, অর্থাভাবে আমাদের ছোটলোকদের ছেলেদিগকে পড়াইয়া পণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কি আমাদের জাতীয় উন্নতির দিকটা দেখেন! তাঁহারা বিলাসবাসনা চরিতার্থ ও অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টাই করিয়া থাকেন।

আমার মনে আছে আমাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যার দৌড় চমৎকার! ছেলেরা বলিল "সসাগরা" মানে কি পণ্ডিত মহাশয়? পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—এ সহজ কথাটাও তোমাদের মাথায় প্রবেশ করিল না—ওহে বাপু! শসার

মত গড়িয়ে গড়িয়ে পৃথিবী চলে বলিয়া "সসাগরা পৃথিবী" হইয়াছে। আমাদিগকে পড়াইবার জন্য এই প্রকারের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা বিনা পরিশ্রমে বাবুগিরী করিবার চেষ্টা করেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া চাকুরী করিবার জন্য ব্যস্ত হন—এই দৃষ্টান্তে আমাদের সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। যে দুই চারিটী স্বজাতীর আদর্শ আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে—তাহাত ষোলআনা গোলামীর। বিলাস ও বাবুগিরীতে পূর্ণ। সুতবাং আমরা মরিব বৈ কি! আমরা কোন্ আদর্শ লইয়া উন্নত হইব? এই যে আমাদের দেশের সৌভাগ্য, উন্নতি, শিক্ষা, ধন, সম্পদ তাহা আমাদের ছোট-লোকের জাতিকে কেনা গোলাম করিয়া রাখিয়া লাভ করিয়াছে। আমাদিগকে কেনা গোলাম করিয়া না রাখিলে, এ সমুদায় সৌভাগ্য কি এদেশবাসীর লাভ হইত? প্রবাসীরা আসিয়া যে কোটী কোটী টাকা লাভ করিতেছেন, তাহাত আমাদের দেশের ইতর ভদ্রেই গোলামী করিয়া, করিয়া দিতেছে? ছোটলোক-দিগকে উন্নত করিতে, কর্ম্মঠ জাতিরূপে গড়িয়া তুলিতে, তাঁহাদের উচিত ছিল। আমাদিগের সমাজে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল।

আমাদের পল্লীর একক্রোশ দূরে, একটা বুনো জমি ছিল। তথায় চাষ আবাদের বিলক্ষণ সুবিধা সত্ত্বেও, কোন কৃষক তথায় চাষ আবাদ করে নাই। বৎসর তিন হইল, তথায় কয়েক ঘর পাহাড়ীয়া সাঁওতাল আসিয়া বসিয়াছে। তাহারা সেই স্থানটী

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়াছে—তাহারা দুইটী পৃথক পল্লীর সমাবেশ করিয়াছে। প্রতি পল্লীতে আট দশ ঘর করিয়া বাসিন্দা হইয়াছে। তাহারা সবল, সুস্থকায়, পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেখিতে দেখিতে তাহারা বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, যেন যাদুমন্ত্রে সেই ভীষণ স্থানটীকে অমরাবতীতে পর্য্যবসিত করিয়া তুলিয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই পরিশ্রমী। বিলাসীতার নাম গন্ধও তাহাদের মধ্যে নাই। যাহা কিছু সত্য ও সরল তাহা তাহারা ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহারা ধনুক সাহায্যে তীর ছোড়ে—অব্যর্থ সন্ধান। বীরের জাতি—দেহে অসুরের বল, অসীম সাহস। সভ্যেরা তাহাদিগকে অসভ্য, পাহাড়ে, বর্ব্বর জাতি বলিয়া থাকে। তাহারা লেখা পড়ার ধার ধারে না। চাষ আবাদ দ্বারা তাহারা লক্ষ্মীমন্ত। তাহারা গুনবন্ত! তাহারাই বুদ্ধিমন্ত! ঐ রকম থাকিয়া যদি তাহারা বিদ্যা শিক্ষা করে, বিজ্ঞানে উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দুনীয়ার কোনজাতি পারিয়া উঠিবে না।

আমরা বাঙ্গালী, ছোট লোকের জাতি। আমরাও কিন্তু ঐ সাঁওতালদিগকে অসভ্য বলি। আমরা গোলামী করি—আমাদের স্ত্রীলোকেরা বাঁদী। আমরা গোলামের জাতি। আমরাও পাহাড়ে সাঁওতালকে অসভ্য বলি! সাঁওতাল কিন্তু কাহার গোলাম নয়! গোলামীর সীমানায় পা দিবে না। স্বাধীনতার উপর উহাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত। যদিও সভ্যেরা কলে, বলে, কৌশলে তাহাদের মধ্যে গোলামী করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত

করিয়া তুলিতেছে কিন্তু আমাদের বর্ণিত এই কয়েক ঘর পাহাড়ীরা বা সাঁওতাল, কোন পুরুষে গোলামী করে নাই। এ প্রকার স্বাধীন প্রকৃতির বন্য জাতি, এদেশে অনেক দেখা যায়।

আমি সময়ে সময়ে তাহাদের নিকট যাইতাম—তাহাদের লাঙ্গল ধরিয়া জমি চষিয়া তাহাদিগকে দেখাইতাম। তাহারা পোষাকী বাবু দিগকে বড় ঘৃণা ও ভয় করে! আমাকে দেখিয়া তাহারা তাদের মধ্যেকার লোক ভাবিয়া লইয়াছিল। আমি তাহাদের নিকট পরিচিত হইয়া গিয়াছি। সাঁওতালদের ব্যবহার দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগিত—সরলতায় হৃদয় পূর্ণ—কপটতা প্রবঞ্চনা তাহাদের মধ্যে আদৌ নাই। তাহাদের হৃদয় শিশুর তুল্য ভয়হীন। সেই কারণেই সভ্যেরা সাঁওতালকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া থাকে। তাঁহারা স্বাধীনতা প্রিয়—সম্ভবতঃ বর্ব্বরেরা স্বাধীনতা অবলম্বন প্রয়াসী হইলে, সভ্যের নেত্রে বিষবৎ বোধ হয়—সেই কারণে সাঁওতাল অসভ্য বর্ব্বর! উহারা স্বাধীনতার আদর্শ। নিজের কাজ নিজে করে—বনের বাঘ মারে—বন কাটিয়া সভ্যদের জন্য কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সেই কারণে হয়ত উহারা অসভ্য! উহাদের নৃত্য বল নাচের অনুকরণ সুতরাং এই হিসাবে ইহারা সভ্য হইতে পারে। আমি কিন্তু ইহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। উহারা "যায় প্রাণ থাকে মান" ভাবিয়া কখন গোলাম হয় নাই। আমরা গোলামের জাত। কিন্তু আমাদিগকে দেখিয়া উহারা কখন ঘৃণা করে নাই। উহারা যে সভ্য জাতি এ ভাবও উঁহাদের হৃদয়ে কখন উদয় হয় না।

উহারা যাহা আছে তাহাই থাকিতে চায়। অহঙ্কার নাই—অপর জাতিকে ঘৃণা নাই। সুতরাং জাতিসমস্যার মীমাংসা করিতে আদৌ চিন্তিত হইতে হয় নাই। উহারা কেতাবী পড়া শুনা আদবেই পছন্দ করে না। তাহারা এই প্রকার পড়া শুনার দোষের দিক্‌টা, সম্ভবতঃ উজ্বল ভাবেই দেখিতে পাইয়াছে। আমাদের চক্ষে গুনের দিকটাই, উজ্বল হইয়া ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিয়াছে। উহারা দোষ গুনের বিচার করিয়া, দোষের মাত্রাটাই অত্যধিক দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা বিলাসী, বিলাসের মোহে—বিলাসের কল্পনার প্রভাবে বিভোর থাকি বলিয়া কেবল সুখের স্বপ্ন দেখি, দুঃখ নিকটে দাঁড়াইয়া হাস্য করে। উহারা এ সকলের ধার ধারে না—দুঃখের মধ্যে সুখ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লয়। দুঃখ ক্রমশঃ উহাদের নিকট হইতে সরিয়া আমাদের নিকটে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রায় দুই তিন মাস তাহাদের গ্রামে যাইতাম। তাহাদের সহিত মিলিত হইতাম। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে আমাদের কৃষি-ক্ষেত্র কারখানা ও বিদ্যালয় দেখাইতাম—ছেলেদের থাকিবার ঘর দেখাইতাম, আর তাহাদের মড়লদের অনেক খোসামোদ করিতাম।

মধ্যে মধ্যে তাহারা আমাদের ক্ষেত্রে রোজে কাজ করিয়া যাইত কিন্তু তাহাদের ছেলেদিগকে, আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা-দিবার জন্য কিছুতেই দিতে চাহিত না। ক্রমে তাহাদের মধ্যে কামারের ও কাঠের কার্য্য শিক্ষার লোভ হইল। আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। তাহাদের মধ্যে তিনটী বালক আমাদের বিদ্যা-

লয়ে প্রবেশ করিল। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। ছাত্রাবাসে কয়েকটী শয্যা খালি ছিল। প্রথমে সেই স্থানে রাখিলাম। সদানন্দ দাসের অতিশয় আনন্দ। সাঁওতাল বালকত্রয়কে দেখিবার শুনিবার ভার, আমার উপরেই পড়িল। ছাত্রাবাসের ছাত্রগণমধ্যে কোন আপত্তি হয় নাই। সকলেই তাহাদিগকে যত্ন করে, ভালবাসে। উহারা প্রথম ভাগ পড়ে এবং একজন কাঠের কারখানায় এবং দুইজন কর্ম্মকারশালায় লোহার কাজ শিক্ষা করে। সাঁওতাল তিন জন যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন তাহারা তাহাদের তীর ও ধনুক সঙ্গে আনিয়াছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ছাত্রাবাসের প্রত্যেক ছাত্র, এক একটী ধনুক ও কতিপয় লৌহফলকহীন চুঙ্গী পরান শিক্ষা-তীর লইয়া লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সময়ে তাহারা অবকাশ পায়, সেই সময়েই সাঁওতাল বালকগণ, ছাত্রাবাসের সমুদায় ছাত্রকে লইয়া ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেয়। এ এক প্রকার অপূর্ব্ব দৃশ্য—আমাদের নৈশ বা দিবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, এ প্রকার শিক্ষা সম্বন্ধে কল্পনাই করিতে পারেন নাই। প্রতিদিন একবার করিয়া বালকত্রয়ের পিতামাতা তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেন। ক্রমে বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রই ধনুর্বান ছোড়া শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীগণ আমাদের বিদ্যালয়ে আসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের জাতীয় তিনটী বালক পড়ে—অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হয়। কাজ শিক্ষা করে—সকল বালকগণের সহিত একত্র পড়ে, কাজকর্ম্ম করে, আহার করে,

শয়ন করে, বেড়ায় এ দৃশ্য দেখিয়া তাহারা সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছে। প্রত্যুপকারপরায়ণ জাতি—মধ্যে মধ্যে তাহারা বিনা অর্থে স্কুলের কাজ করিয়া দেয়। একদিন সদানন্দ, মোড়লকে বলিল—মোড়ল, সকল ছেলেকে লইয়া পরীক্ষা কর?—তোমাদের ছেলেরা আমাদের স্কুলের সকল বালককে তীর ছুড়িতে শিক্ষা দিয়াছে—কে কেমন শিক্ষা পাইয়াছে একবার দেখ দেখি? মোড়ল ও সাঁওতালগণের ভারি আনন্দ, স্ত্রীলোকেরা হাততালী দিয়া হাঁসিয়া উঠিল।

বিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে গিয়া, ফৌজের মত বালকগণ তীর ধনুক লইয়া দাঁড়াইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—এ দৃশ্য আমরা কখন দেখি নাই। কল্পনাবলেও এ দৃশ্যের চিন্তা সম্ভবে না। মড়ল, তীর ধনুক লইয়া তাহাদের সম্মুখে পাইচারি করিতে করিতে ধনুক ধরিবার, জ্যা রোপন করিবার, তীর ছুড়িবার কায়দা প্রথমে নিজেই দেখাইয়া দিলেন। পরে সকল বালককে ধনুকে জ্যা (ছিলা) রোপন করিতে বলিলেন। সকলে বাম হাতে ধনু ও দক্ষিণ হাতে ফলক বিহীন তীর লইয়া বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া, বাম পদ অগ্রে সংস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মোড়ল এই বালক ও যুবক ফৌজগুলিকে একে একে দক্ষিণ ভাগ হইতে, তীর নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। কাহার তীর কত দূর যাইতেছে তাহারই পরীক্ষা হইল। সাঁওতাল বালকত্রয় এ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইল। তাহার পর লক্ষ্য-ভেদ পরীক্ষার কৌশল, লক্ষ্যস্থির কি করিয়া করিতে হয়—তাহা

মোড়ল সেনাপতি দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং সেই প্রকার ভঙ্গি করিয়া তীর ছুড়িলেন। মোড়লের অব্যর্থ সন্ধানে, নারিকেল বৃক্ষ হইতে একটী নারিকেল ভূপতিত হইল। একটী বৃক্ষের এক স্থানে একটী হাঁড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হইল। দূর হইতে সকলকে উহাই লক্ষ্য করিয়া তীর ছাড়িতে বলা হইল—এই পরীক্ষায় সাঁওতাল বালকত্রয় ও অপর দুই জন শ্রেষ্ঠ হইল। এই ব্যাপারে সাঁওতালদের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ হইল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে, এই জয় নিবন্ধন জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। সেই দিন এই পর্য্যন্তই হইয়াছিল।

কি শুভক্ষণে এই ধনুকোৎসব হইয়াছিল বলিতে পারি না। ভগবানের কৃপায়, সাঁওতাল নরনারী বিদ্যালয়, কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রকে যেন তাহাদের নিজের বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক সাঁওতাল পল্লী হইতে প্রায় ত্রিশটী ছাত্র, আমাদের ছাত্রাবাসে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা চাষ, শিল্প, বাণিজ্য কার্য্যে অতিশয় কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে। পড়াশুনা মন্দ করে না। মধ্যে মধ্যে সাঁওতাল নরনারী আসিয়া নৃত্য গীতোৎসব করিয়া থাকে। আমাদের ছোটলোক-দের মধ্যে, সাঁওতালগণই যেন এই বিদ্যালয়টীকে আপনার ভাবিতে সমর্থ হইয়াছে—পঁচিশ ত্রিশ ক্রোশ দূর হইতে সাঁওতাল বালক বিদ্যালাভার্থে, কৃষি-শিল্প শিক্ষার্থে আগমন করিতেছে। ইহাদের উৎসাহ অধ্যবসায় অসাধারণ। এখন তাহারা বালকদের জন্য চাল, ধান অর্থ স্বরূপ দিয়া থাকে। কোন কোন

অভিভাবক দুই পাঁচ দিন কৃষি-ক্ষেত্রে কাজ করিয়া দেয়। বালকেরা পরিশ্রম দ্বারা মাসে দুই তিন টাকা বা ততোধিক উপার্জ্জন করে সুতরাং তাহাদের জন্য আমাদিগকে এক্ষণে আর চিন্তিত হইতে হয় না। সাঁওতালগণই বিদ্যালয়ের আয় বাড়াইয়া দিয়াছে—ইহারা এক্ষণে আমাদের বিদ্যালয়ের বন্ধু-স্থান অধিকার করিয়াছে। সাঁওতাল পুরুষেরা সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করে, কেবল তাহাদের স্ত্রীগণই গ্রহণ না করিয়া স্বাতন্ত্রতা রক্ষা করে এবং জাতীয়তা বজায় রাখিয়া থাকে।

সাঁওতাল বালকগণ কৌপীন পরে, বড় কাপড় দিলেও কোমরে জড়াইয়া রাখিতেই তাহাদের বস্ত্র ফুরাইয়া যায়। মাথায় লম্বা চুল রাখে। চুল আঁচড়াইয়া, তাহাদের খোঁপায় কাঠের চিরুণী গুঁজিয়া রাখে। সালপাতে, গাবপাতায় জড়াইয়া চুরুট প্রস্তুত করে, সেই চুরুট লইয়া তাহারা মধ্যে মধ্যে ধূমপান করে। চৌকির উপর শয়ন করিতে চায় না। এ সকল জাতিগত দোষ—এ দোষ দোষাবহ নহে। ভারতের সকল জাতির মধ্যে, এই রকমের জাতীয় 'গোঁ' আছে। সেটা তাহারা ছাড়িতে পারে না। উৎসবের দিবস বিদ্যালয়ে উৎসব হয় এবং সেই দিবস মেলাতে গিয়া সকল ছাত্রগণ বিবিধ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া বিক্রয় করে। যাহারা ভদ্র, সভ্য তাহারা এবং তাহাদের বালক ও যুবকগণ সাঁওতাল বালকদের সহিত একত্রে পাঠ, একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ ও ক্রীড়া কৌতুক করিতে চাহে না। তাহারা সমষ্টিগত ভ্রাতৃভাব

হইতে দূরে দূরে বেড়ায়। অনেক ভদ্রলোককে এই প্রকারে মিলিতে মিশিতে শিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতে এবং সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছি কিন্তু কার্য্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিতে পারি না।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখায়।"

এই মহৎ বাক্যের স্বার্থকতা দেখিতে পাই না বলিয়া দুঃখ হয়। তাঁহারা মুখে যাহা বলেন কার্য্যতঃ তাহা দেখাইতে পারেন না—অথবা চাহেন না। তাঁহারা মোহ বশতঃ আমাদিগকে অকেজোর দল ভাবিয়া, ছোট লোক ভাবিয়া, ঘৃণা করেন। এ মোহ কোন্ দিন দূর হইবে! আমার মনে হয় একটা যাদু মন্ত্রে এই সকল মোহ একবারে দূর করিয়া দিই। হাত পা ত্যাগ করিয়া কে কোথায় হাঁটিয়া গিয়াছে। হাত পা ক্ষতে পূর্ণ থাকিলে সমগ্র দেহ ভার হইয়া পড়ে। এটা কবে তাঁহারা বুঝিবেন! পরমেশ্বর কবে বাঙ্গালার এ মহৎভাব আনিয়া দিবেন!

সাঁওতাল বালকগণের কৃতিত্ব আছে, হৃদয় আছে। তাহারা আমাদের নিকট আনন্দের সহিত অবস্থান করিত। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে গৃহে যাইবার অনুমতি দিতে হইত। ইহাতে তাহাদের স্বজাতির মধ্যে একটা উৎসাহ দেখা দিত। তাহারা বাড়ীতে গিয়া কৃষি-কার্য্য করিত। বিদ্যালয়ের বীজাগার হইতে অনেক সময় তাহারা বিবিধ তরি তরকারীর বীজ লইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে উহার আবাদ করিত। তাহাদের কৃতিত্বের কথা, হুগলীর কৃষি-বিদ্যালয়ের কথা, শিল্প-বিদ্যালয়ের কথা সাঁওতালদের মধ্যে

রাষ্ট্র হইয়া গেল। আমাদের গোল্যামাবাদের ছাত্রেরা ছুটীর সময় যখন আপন আপন পল্লীতে যাইত তখন তাহাদের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া ছোটলোকগণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। হুগলী জেলার বাহিরের অনেক পতিত জাতীয় অভিভাবক, আপন আপন পুত্র-দিগকে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থ আনয়ন করিত।

বাগ্দী, মুচী, হাড়ী, ডোম, লেট, কোঁড়া, ও বাউড়ী বালকে বিদ্যালয় পূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, অপরাপর স্কুলের মত এই বিদ্যালয়ে কেবল কেতাবী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখানে মানুষ গড়িয়া তুলিবার মত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের শিক্ষার সহিত কেতাবী বিদ্যার অনুশীলন হইয়া থাকে।

সাঁওতালগণের তাঁত বুনিতে শিক্ষার আন্তরিক ইচ্ছা। তাহাদের পিতা মাতারা আমাদিগকে কাপড় বুনিতে শিক্ষা দিবার জন্য অনেকবার বলিতে আরম্ভ করিল। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহাদের জন্য তাঁত বসাইতে হইল। তাঁতের জন্য পৃথক গৃহ নির্ম্মিত হইল। গৃহের সমুদায় কার্য্য বালক ও যুবকগণই সম্পাদন করিল। মাটী কাটা, কাদা করা, দেওয়াল দেওয়া, কাঠাম, ছাউনী, খড়খড়ি দোর জানালা সকলই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের হাতে হইয়া গেল। নূতন প্রথার এবং পুরাতন প্রথার চারিটী তাঁত বসিল। তাঁতের সকল সরঞ্জাম যথা স্থানে সজ্জিত হইল। তাঁত-বয়ন শিক্ষক মিলিল—পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার নিবাস, জাতিতে নমঃশূদ্র। তাঁতের কার্য্যে বিলক্ষণ পটু। তারাপদ বাবুর কৃপায়

আমরা এই শিক্ষকটী লাভ করিলাম। বেশ কাজের লোক। তাঁতের খুটীনাটী সকলি সুন্দর ভাবে তাঁহার জানা আছে। বর্ত্তমান-কালে সতরটী তাঁত চলিতেছে। গেঞ্জীর, মোজার ও কার্পেট বোনা কলের সাহায্যে শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সেই গোলা-মাবাদটী এখন একটী কারখানা-পল্লীতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীটীর সকল নরনারী যেন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী এবং সকলেই ছাত্র ও ছাত্রী।

যতই আমরা অবনত জাতির উন্নতি চেষ্টা করিতে থাকিব ততই আমরা উন্নত হইতে থাকিব। সভ্য ভদ্রগণও আমাদের উন্নতিতে উন্নত হইতে থাকিবেন। আমরা ছোটলোক, আমরা যে পরিমাণে অবনত রহিয়াছি, ধীরে ধীরে আমাদের চেষ্টায় আমরা ঠিক সেই অনুপাতে উন্নত হইবই হইব। ঈশ্বর আমাদের স্বহায়। এখন আমাদের মধ্যেই আমরা শিক্ষক পাইতেছি। মোসলমান, বাগ্দী, মুচী, হাড়ি, ডোম, লেট, কোঁড়া, বাউড়ী পদ্যরাজ, নমঃশূদ্র, সাঁওতাল ছাত্রগণই এক্ষণে অনেকে এই বিত্থালয়ের শিক্ষক। চব্বিশপরগণা, মালদহ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শীদাবাদ এবং বরিশাল, খুলনা, মৈমনসিং প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথম যখন বিত্থালয় প্রতিষ্ঠা হয় তখন মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, এক দিন এই “জাতীয় বিত্থালয়” বঙ্গের আদর্শ হইবে—পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর ন্যায় দেশোদ্ধার কল্পে গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে।

এই বিত্থালয়ের কল্যাণে, নৈশ-বিদ্যালয়ের কল্যাণে, কৃষি

শিল্প, বাণিজ্যের কল্যাণে দেশের মধ্যে, অবনত জাতিগুলির পরম কল্যাণ সাধিত হইতেছে। সকলের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের পন্থা হইয়াছে। বাবুগিরীর উপর ঝোঁক কমিয়া যাইবে বলিয়াই বিশ্বাস হয়। আমি দেখিতে পাইতেছি, আমাদের ছোটলোক ও সাঁওতাল এবং মুসলমান বালকদিগের মস্তিষ্কের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আমি স্কুলে পাঠকালে এবং কলেজের অধ্যয়ন ব্যপদেশে বুঝিয়াছি, সুসভ্য ভদ্রলোকের বালকগণের মস্তিষ্কে আর আমাদের ছোটলোকদের বালকগণের মস্তিষ্কে কোনই প্রভেদ নাই। উভয় জাতির মধ্যে যোগ্যতা ও অযোগ্যতা যেন সমান বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছে।

ভদ্রগণ মধ্যে, উন্নত জাতীয় কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে, আমাদের উপর, আমাদের বিদ্যালয়ের উপর, চরম বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহারা আমাদের উন্নতিতে একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতেছিলেন। আমাদের এই হিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা যে দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছি, তাহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেও লজ্জাবোধ করিতেন না! কোন্ উপায়ে তাঁহারা আমাদের এই অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে চূর্ণ করিয়া দিবেন তাহার 'ফন্দি' আঁটিতে বাকি রাখেন নাই। আমাদের কার্য্যপ্রণালী আদৌ সুন্দর নহে। আমাদের প্রথার সহস্র দোষ। আমরা দেশের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি। ভবিষ্যতে দেশটা রসাতলে দিবার পন্থা করিতেছি। এখানে কিছুই লেখা পড়া হয় না। কেবল

কতকগুলা গুণ্ডা তৈরি হয়। ছোটলোকগুলা "আস্কারা" পাইয়া মাথায় উঠিতেছে। পায়ের জুতা মাথায় উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। কতকগুলা বদ্‌মাইস্ জুটিয়া, দেশটাকে মাটী করিতেছে। দেশের ছোটলোকগুলার মাথা খাইতেছে। ইহারা দুদিন পরে ডাকাতি করিবে। ভদ্রলোকের ধন, মান, সম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে। ঘোর কলি পড়িয়াছে—সব ম্লেচ্ছ হইয়া যাইবে। দেশের মুসলমান, ম্লেচ্ছ, আর হাড়ী, মুচি, ডোম, বাগ্দী লইয়া ইহাদের বসবাস—কুসংসর্গে পড়িয়া পাষণ্ডের দল গড়িয়া উঠিতেছে। নৈশ-বিদ্যালয়, দিবা-বিদ্যালয়, রবিবার বিদ্যালয় এই কত রকম বিদ্যালয় খুলিয়া ম্লেচ্ছের দল বৃদ্ধি করিতেছে। কুরুচি, কুভাব, কুঅভ্যাস দ্বারা ধর্ম্মটা—এমন সনাতন হিন্দুধর্ম্মটা, মাটী করিতে বসিয়াছে। সমাজশাসন আর থাকিবে না—কেহ কাহাকে মানিবে না—জন, মজুর, দাস ও দাসী আদৌ মিলিবে না। দেশটা ডুবিয়া যাইবে। হিন্দুধর্ম্ম ম্লেচ্ছের ধর্ম্ম হইবে। ইহাই তাঁহাদের মত। তাঁহারা আমাদের সর্ব্বনাশ কামনা করেন। আমরা কিন্তু তাঁহাদের হিতকামনাই করিয়া থাকি।

ভগবান অবগত আছেন, আমাদের ইচ্ছা কি! আমরা আমাদের উন্নতির উপায় করিতেছি—ইহাতে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইবে সুনিশ্চয়। তাঁহারা আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দেখিতে পাইলেই গালি দিতেন, ধমকাইতেন, নিন্দা করিতেন—ভয় দেখাইতেন—ছাত্রদের অভিভাবকগণকে বুঝাইতেন—তাহারা

কাহার বুদ্ধিতে পড়িয়া—কৃষিবিদ্যালয়ে, শিল্পবিদ্যালয়ে, শ্রমজীবী-বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাইতেছে। তাঁহারা কৌশল করিয়া, আমাদের বিদ্যালয়ের বালকদিগকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। শিক্ষকগণকে অপমান করেন। মিথ্যা দুর্নাম রটাইয়া, শিক্ষকদের নিন্দা করিয়া, বিদ্যালয়ের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করেন। এইসকল কার্য্য তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়াছে। তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি—এই বিদ্যালয়ের উচ্ছেদ সাধনার্থ সমাপ্ত হইতেছে। এমন লোকও সংসারে জন্মগ্রহণ করে! ইহাঁরাই ভদ্র, সভ্য বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন, নিন্দা, দ্বেষ, হিংসাই ইহাঁদের জীবনের মধ্যে পূর্ণভাবে আধিপত্য করিতেছে। আমার দুঃখ হয়—এই সকল জ্ঞানপাপীর কি চৈতন্য হইবে না? ভগবান্ ইহাঁদিগের হৃদয়ে শান্তি প্রদান্ করুন। ভগবান মঙ্গলময়, তিনি এই ভদ্র মহোদয়গণের মঙ্গলার্থ তাঁহাদের হৃদয় মহান্ করিয়া দিবেন! আমরা তাঁহাদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হই। কখন ক্রোধ বা হিংসা করি না। আমরা জানি—আমরা সৎকার্য্য করিতেছি কি অসৎ কার্য্য করিতেছি। আমরা জানি সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের ব্যবহারে আমরা বিচলিত হই না, কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাইতেছি। আমাদের জয় অনিবার্য্য! এই নিন্দুক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত গোলামের সংখ্যাই বেশী বলিয়া বোধ হয়। অনেক জাতিশ্রেষ্ঠ, আমাদের মাথার মণি—যাঁহারা ত্যাগবলে, ধর্ম্মবলে জ্ঞানবলে আমাদের সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা কৃপা করিবা মাত্র, পতিত উদ্ধার হইয়া যায়।

যাঁহাদের অঙ্গুলি হেলনে, ধর্ম্ম গঠিত হয়—ধর্ম্ম বিদায় গ্রহণ করে। যাঁহারা সমাজ শাসক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ বিবেচনা করেন। তাঁহারাই ত্যাগবলের মহিমা ভুলিয়া আমাদের বিদ্যা-লয়ের, আমাদের পতিত জাতির, সর্ব্বনাশ করিতে সমুৎসুখ হইয়াছেন! তাঁহাদের ধারণা আমরা পৃথিবীকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছি—তাই তাঁহারা কোমর বাঁধিয়াছেন।

এই দলের একজন ব্যক্তি, সাঁওতাল মহলে এই বিদ্যালয়ের নিন্দা পূর্ব্বক, তাহাদের বালকগণকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সাঁওতালগণকে, তাঁহাদের প্রভুত্ব কতদূর প্রবল তাহা দেখাইবার জন্য—শাসন করিতে গিয়া যে, কীদৃশ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহা তিনি এজীবনে আর ভুলিবেন না। "চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।" যেস্থানে তাঁহাদের শাসন কার্য্যকরী হইবে না, সে স্থানে ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া, আমাদের পতিত জাতির অমঙ্গল করিতে যাইলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেই হইবে। আমরা ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম।

আমাদের দেশের মঙ্গল কোথায়? বহু দূরে না নিকটে? আমরা দেখিতেছি ছোটলোকদিগকে শিক্ষিত ও কর্ম্মঠ করিয়া তুলিতে পারিলে, সমাজের ও দেশের মঙ্গল হইবে। কোন ভদ্র লোক আমাকে বলিয়াছেন, "তোমাদের শ্রেণীর লোকেরা যত লেখাপড়া শিখিবে, ততই আমরা আর দাস, দাসী, মুটে মজুর পাইব না। তোমরা কেরাণীগিরি করিতে আরম্ভ করিলে, আমাদের অন্ন মারা যাইবে। তোমরা স্বাধীনভাবে কৃষি আরম্ভ

করিলে, আমাদিগকে চাষ ছাড়িতে হইবে। চাষের জমিও মিলিবে না। আমাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। তোমাদের দৌরাত্ম্যে ইতিমধ্যেই অফিসের কাজ কর্ম্ম আর আমাদের সহজে পাইবার উপায় নাই। ছোট খাট ব্যবসা, বাণিজ্য তোমরা ও মোসলেম ভাইরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছ। চাষ-বাস করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের পায়ে তেল দিতে দিতে হয়রাণ হইয়া যাইতেছি। দেখিতেছি ক্রমশই তোমরা সপ্তমে চড়িয়া উঠিতেছ। একটী চাকর, একটী ঝি মেলা দায় হইয়া উঠিতেছে। তোমরা, তোমাদের সমাজে শাসন আরম্ভ করিয়াছ। তোমাদের স্ত্রীলোকেরা খাইতে না পাইয়া মরিলেও, আমাদের বাড়ীতে চাকরাণীর কাজ করিতে আসিতে চাহিতেছে না। তোমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল কাজ কর্ম্ম করিতে, এক্ষণে উন্নত হইতেছ, সমাজ বাঁধিয়াছ, সেইজন্য আর সেই সকল কাজ কর্ম্ম করিতে চাহিতেছ না। ইহারি মধ্যে তোমরা যাহা করিয়া তুলিয়াছ, তাহাতেই আমাদের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে! আরও অগ্রসর হইতে দিলে, তোমাদের জাতিরা আমাদিগকে তৃণের মত ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিবে। কলির প্রাধান্য বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছে—

"নীচ হইল উর্দ্ধগামী, উচ্চ হইল নত।"

যে বিলে অগাধ জল ছিল, কুম্ভীর থাকিত সেই বিল এখন শুষ্ক এবং শ্রেষ্ঠ কৃষি ভূমি হইয়া উঠিল। আর যাহা শ্রেষ্ঠ কৃষি ক্ষেত্র ছিল, তাহা উচ্চ ও উষর হইয়া পড়িল। ডোবা, ডহরের

আদর হইয়া উঠিতেছে। এখন ভালর আদর নাই, মন্দের আদর বাড়িয়া উঠিল। তোমাদের জাতিকে আর প্রশ্রয় দেওয়া কোন ভদ্র সমাজের উচিত নয়। তোমরা আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার উপক্রম করিতেছ।"

আমি তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিয়াছিলাম—"মহাশয়! আমরা কি ভদ্র সমাজের অপকার করিতেছি? আমরা ঘর সামলাইলে যদি আপনাদের অমঙ্গল হয়, তাহাতে আমাদের দোষ কি? আমরা আমাদের ছোটলোক অসভ্য বর্ব্বর গুলাকে উন্নত করিতে চাই। আমরা আপনাদের অমঙ্গল কামনা আদৌ করি না। আমাদের ভাঙ্গাঘর কি আমরা নিজে নিজেও মেরামত করিব না! আমরা কি বর্ষার জলে ভিজিয়া মরিব! গ্রীষ্মের রৌদ্রে পুড়িব! তত্রাচ ভাঙ্গাঘর খানি মেরামত করিতেও পারিব না! আমরা চাষা ভূষা, আমরা কি নিজের অন্ন উপার্জ্জনের জন্যও কৃষি করিতে পাইব না! আমরা কেরাণীগিরী করিতে চাই না—তবে আমাদের পতিত জাতির মধ্যে কেহ কেহ কেরাণী-গিরী করিতেছেন—তাহা আপনাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে। আপনারা ক্রমে উচ্চ উচ্চ সোপানে উঠিয়া পড়ুন। নীচেকার সোপান দু একটা না হয় দয়া করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন না? আমরা বহুকাল নর্দ্দমায় পড়িয়া আছি। আপনারা আমাদের স্কন্ধে পদার্পণ করিয়া নর্দ্দমাটী পার হইতে ছিলেন—সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আমরা একটু আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এই নর্দ্দমার উপর একটা সেতু নির্ম্মাণ করি-

লেই হইবে। আপনারা সাহায্য করিবেন, আমরা নর্দ্দমার উপর সেতু বাঁধিয়া দিব। আপনাদেরই গমনাগমনকালে পদতল পঙ্কিলময় হইবে না।

দাস, দাসী, চাকর, চাকরাণীর কি অভাব হইবে? তাহা যদিই হয়, তাহাতে আপনাদেরই মঙ্গল হইবে। একটু স্বার্থ-ত্যাগ করিলেই, আপনাদের উদার হৃদয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। আপনারা ভদ্র ও মহৎ—মহত্ত্ব ত দেখাইতে হইবে! পরের স্কন্ধে আর কতদিন চাপিয়া চলিবেন! স্বাবলম্বনটা কি বর্ত্তমান সমাজের মঙ্গল বিধান করিবে না? আলস্য দূর হইবে, জড়তা ও দুর্ব্বলতা প্রনষ্ট হইবে। আপনারা মহৎ হইতে মহত্তর ও মহত্তম হইবেন। রমণীগণ কর্ম্মঠ হইবেন। আমরাও আপনাদের সেবা করিব। এতকাল অন্ধ বিশ্বাসের উপর আমরা আমাদের সমাজটাকে হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রভাবে আমরা—পরের বিকৃত ধ্বংসকরী শাসন হইতে—আমাদের সমাজ-শাসনের ভার আমাদের নিজের ঘাড়েই লইতেছি।

আমরা এক্ষণে বুঝিতে শিখিয়াছি—আমাদের ছোটলোকদের সমাজে কি কি দোষ, গুণ, অভাব অভিযোগ আছে। আপনারা এতকাল আমাদের শিক্ষক ছিলেন—আপনাদের শিক্ষার গুণে এক্ষণে আমরা নিজেদের সমাজ নিজেরাই চালাইতে চাই। ইহাতে আপনাদেরই গৌরব। এতদিন আপনাদের নিকট শিক্ষা করিয়া আমরা কেমন শিখিলাম তাহার যদি কৃতিত্ব দেখাইতে পারি—তাহা হইলে শিক্ষকেরই গুণ বৃদ্ধি হয়, মান বৃদ্ধি হয়।

ক্লাশের শিক্ষকের নিকট পড়িয়া যদি ক্লাশ প্রমোশন পাই, তাহা হইলে শিক্ষকেরই মান ও যশ বৃদ্ধি হয়। আমরা আপনাদের শিষ্ট ছাত্র। কেমন শিখিলাম তাহারই পরিচয় দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছি, এই শ্রেণীতে আবার আপনারাই অধ্যাপক। কালের প্রভাবে, কালমাহাত্ম্যে জলাভূমি উন্নত হইতেছে। এ ভূমিতে কৃষিকার্য্য হয় নাই, ইহা সারপূর্ণ ও সরস, সেই জন্য ইহা আদরের—দুনা ফসলফলিবে। উচ্চ ভূমি কৃষিকার্য্যে বহুকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—আশানুরূপ সার দেওয়া হয় নাই! খাদ্যাভাবে ভূমি-দেবী শীর্ণা, দুর্ব্বলা, হইয়াছেন। তাই উষর হইয়াছে। আপ-নারা সেই পূর্ব্ব কৃষিভূমিতে উপযুক্ত সার প্রদান করিলেই চারিপোয়া ফসল পাইবেন। উচ্চ-ভূমি বন্যার জলে ডুবিয়া যাইবার ভয় নাই। বন্যা আসিলেই নিম্ন ভূমিই ডুবিবে—তবে পলী পড়িয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। পলি চরম সার। কাজেই কালে যখন ডুবো জমিতে বান চড়িয়া আর দীর্ঘকাল ডুবাইয়া রাখিতে পারিবে না তখন—ডুবো, অকেজো এই জমিগুলিই সারবান শ্রেষ্ঠ জমি হইয়া যাইবে। আপনাদের জমিতে সার দিয়া চারিপোয়া ফসল লইতে হইবে। ডুবো জমি ডাঙ্গা হইলেও বৎসর বৎসর বান আসিয়া পলি ফেলিয়া যাইবে—বিনা সারে বহুকাল ষোলআনা ফসল হইবে। ভালর আদর চিরকালই আছে!—ভাল মন্দ হইলে—দুধ পচিলে আর ব্যবহার করা চলে না। মন্দ একটু ভাল হইলে, নীচ একটু উচ্চ হইলে আদর বাড়ে—পচা গোড়ের

জল, দলদাম মুক্ত হইয়া ভাল হইলে সে জলে ভাত পাক করা চলে। আপনারাই ত পচা গোড়েকে ভাল করিয়াছেন। সেই জন্য গোড়ের জল ভাল পুষ্করিণীর ন্যায় সুপেয় জল হইয়াছে। আমাদের জাতিকে কি আপনারা কখন প্রশ্রয় দিয়াছেন? সমাজ শাসনের কঠিন বোঝা চাপাইয়া পিষিয়া ফেলিতেছেন—গলা টিপিয়া রাখিয়াছেন—তাহাতেও যদি আমরা কোন গতিকে শ্বাস প্রশ্বাস চালাইয়া প্রাণটাকে রক্ষা করি, তাহাতেও কি আমাদের অপরাধ হইতেছে?

আমি আমার ছোটলোক বন্ধুবান্ধবগণকে উন্নত করিতে চাই। জীবনে আমি এই মহৎ সাধন হইতে চ্যুত হইব না। যে কোন প্রকারেই হউক আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা বিস্তার করিবই করিব। আমাদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের পুষ্টিবিধান করিতেই হইবে। আমাদিগকে জমি জমা, এমন কি জমিদারী পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিতে হইবে। এই সকল না করিতে পারিলে আমাদের পতিত জাতির উদ্ধার নাই। কথায় কথায় অপরের নিকট হাত পাতিলে চলিবে না। এই অভাবগুলি আমাদিগকে উন্নতির পথে বাধা দিতেছে। আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে—নূতন ধরণে। কংগ্রেসওয়ালার দ্বারা, কেরাণী, মোক্তার, উকিল দ্বারা কিছুতেই কিছু হইবে না—আমাদিগকেই আসরে নামিয়া আমাদের কাজ করিয়া লইতে হইবে।

আমাদের সমাজে শিক্ষা প্রচার কার্য্য অতি দুরূহ। প্রথমতঃ, আমাদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যাই পৌনে ষোল আনা। তাহার উপর আবার সমাজ একটী হইলেও সহস্র বিভিন্ন বেষ্টনী

আবদ্ধ জাতীয়তার দাঁনা আছে। প্রত্যেক জাতীয় সমাজে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসার, বুদ্ধির, আচার, ব্যবহারের প্রচলন আছে। সকলে সকলের অন্নজল গ্রহণ করিবে না। ধোপা ধোপার কার্য্যই করিবে, সে কখন খুর ধরিবে না। মুচী ভাগাড় কামাইবে, জুতা প্রস্তুত করিবে কিন্তু অপর জাতির কাপড় পরিস্কার করিবে না। এমন কি ধোপাও মুচি, হাড়ী, ডোমের কাপড় ধৌত করিবে না। আমাদের এই পতিত জাতির মধ্যেও বড় ছোট ভাব আছে। যাহারা বড় তাহারা কুলীন, তাহারা ছোটকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না। তদুপরি একই সমাজে যত মানব তত রকম ধর্ম্ম-ভাব আছে—অথচ আমরা হিন্দুধর্ম্ম মানি। প্রতি মানবের রুচি প্রবৃত্তি একপ্রকার নহে। ক্ষুদ্র সমাজগুলিও পৃথক্ পৃথক্ শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেহ কাহার সহিত মিশিবে না। বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন অবস্থা বুঝিয়া আমাদের দেশে আদৌ বিদ্যাদানের ব্যবস্থা নাই। কেরাণী ও গোলাম তৈরি করিবার জন্য সেই মান্ধাতার আমলে যে প্রথার প্রচলন—যে প্রকার কেতাবী শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, তদনুযায়ী কেতাবীবিদ্যা দিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালে আর পূর্ব্বের মত কেরাণী বা গোলামের আবশ্যক নাই কিন্তু সেই শিক্ষার পূর্ব্ব প্রথার যে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা ত বুঝিবার উপায় নাই! আমাদের মত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গণ্ডীদ্বারা আবদ্ধ দরিদ্র লোক-সমাজে, শিক্ষা বিস্তার বড় সোজা নহে। এইক্ষেত্রে অনেক মহাত্মাকে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে—সুফলও ফলে নাই।

অবনত জাতির জনগণকে শিক্ষা দ্বারা তাহাদের সমাজগুলির উন্নতি বিধান করিতে গিয়া অনেককেই বিফল মনোরথ হইতে হইয়াছে। একটা জাতি যদি হইত বা একটা সমাজ যদি হইত তাহা হইলে না হয় হইত।

এ শতমুখী গঙ্গাপ্রবাহ। একটী সমস্যার মধ্যদিয়া ফিরাইবার কি উপায় আছে? ব্যক্তিগত ভাব, সমাজগত ভাব, জাতিগত ভাব, ধর্ম্মগত ভাবগুলা একটা বাঁধিগতের মধ্যদিয়া হাঁকাইয়া লইয়া যাইলে বাগ মানিবে কেন? আমি কাহারও ভাব ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করি নাই। তাহাদের বিভিন্ন ভাবের আশ্রয়েই তাহাদিগকে উন্নত করিয়া, গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই কারণেই কৃতকার্য্যের দিকে অগ্রসর হইবার সুবিধা হইয়াছে। অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া দিয়া, নূতন ভাবে বিভোর করিতে প্রয়াস পাইলেই সকলি ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমি যখন বি, এ, পড়ি, তৎকালেও আমি আমাদের হুগলী শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে পড়াইতাম। রবিবারে ও অপরাহ্নে চাষ করিতাম, লাঙ্গল ধরিতাম তখন হলকর্ষণ ত্যাগ করি নাই। আমার সমপাঠীদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে "হলধর" বলিয়া উপহাস করিত। আমি উহা সম্মানসূচক সম্বোধন বলিয়াই মনে করিতাম। বলিতাম আমার জাতি আমাকে "হালুয়া হারু" বলিয়াই জানে। আমার জন্ম-ভূমির লোকে "ঘোষেদের রাখাল হারু" বলিয়া অবগত আছে। তোমরা "হলধর" বলিয়া আমার মান বাড়াইয়া দিয়াছ।

শ্যামাপদ, মহম্মদ ও আমি একত্রে অবস্থান করি। তিন

জনেই এক্ষণে আমাদের বিদ্যালয়ে পড়াই। তারাপদ বাবুর আহ্বানে মধ্যে মধ্যে আমি তাঁহার গৃহে যাইতাম। শ্যামাপদ, মহম্মদ ও আরও কতিপয় ভদ্রেতর তথায় সম্মিলিত হইতেন। একটী "সাহিত্য-সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই স ভার কার্য্যভার শ্যামাপদ ও মহম্মদের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। মাসে একবার করিয়া এই সভার অধিবেশন হইত। হুগলীর বহু গণ্য মান্য লোক প্রায় এই সভার সভ্য হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম আমি বড় একটা সভা সমিতিতে যাইতাম না। তারাপদ বাবু এক রকম জোর করিয়া আমাকে সভায় যোগদিতে ও সভার কার্য্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন—আমাকে বক্তৃতাও করিতে হইত। আমি সাবধানে বক্তৃতা করিতাম। আমার সহিত দুইজন সাঁওতাল যুবক ও ছোটলোক জাতীয় সাতটী যুবক, সাহিত্য-সভায় যোগ দিয়াছিলেন। আমাদিগকে লইয়া সাহিত্য-সভায় একটু ·গোলযোগ হইবার উপক্রম হয়। তারাপদ বাবু বলিয়াছিলেন—এ ত জাতীয়তী করিতে বসি নাই—দেশী, বিদেশী জাতি বিজাতি যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সাহিত্য সভায় যোগদান করিয়া মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবেন ইহাতে দোষ কি? শ্রাদ্ধ বেশীদূর গড়ায় নাই। কিন্তু সাঁওতাল যুবকত্রয়ের জন্য একটু বেশী বেশী আপত্তি হইয়াছিল। আমরা আমাদের দলবল লইয়া একপার্শ্বে বসিতাম। চেয়ারে বসা এখন অভ্যাস হইয়াছে। কোন কাজের সময় বসি। অন্য সময় বসি না। কয়েকটী খৃষ্টান যুবকগণের সহিত কলেজে বন্ধুত্ব হইয়াছে। তাঁহারা বেশ ভাল লোক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্য-সভার কার্য্যব্যপদেশে পল্লী পর্য্যবেক্ষণ

আমি শ্যামাপদ ও মহম্মদ তিন জনেই বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। দ্বারবাসিনী, হরিপাল প্রভৃতি পল্লী মধ্যে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দরিদ্র মোসলেম পল্লীতে দিবা ও নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহম্মদ ও আমি এই সকল নবপ্রতিষ্ঠিত পল্লীবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি। ক্রমে ক্রমে হুগলি জেলার সমুদয় পল্লীগুলি দেখিলাম। আমার দৃষ্টি থাকিত পতিত জাতির উপর। ছোট-লোকের পল্লীগুলি আমি বিশেষ করিয়া দেখিতাম। কোন কোন পল্লীর ছোটলোক মহলে একটু গৃহস্থ গোছের লোক দেখিতে পাইতাম; তাহাদিগকে গোলামের জাতি হইতে একটু উন্নত বোধ হইত। তাহাদের সন্তানগণ বিদ্যালয়ে পড়িত। কেহ কেহ পল্লীর বিদ্যালয়ে না পড়াইয়া ছেলেকে শীঘ্র শীঘ্র "লায়েক"

করিয়া তুলিবাব জন্য কলিকাতায় ছাত্রাবাসে বা 'মেশে' রাখিয়াছিলেন। আমি ও শ্যামাপদ একদিন হরিপাল গিয়াছিলাম। তখন রেল হইয়াছে, শ্যামাপদের সহিত হরিপালের রায়েদের একটী যুবকের সহিত পরিচয় ছিল, তিনি আমাকেও চিনিতেন। হরিপালের মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সহিত দেখা হয়। আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যান। আমরা রায় মহাশয়ের অতিথি হইয়াছি। বাটীর কর্ত্তা কলিকাতার একজন পাটের দালাল। তিনি আমাদের সহিত দুই চারিটা কথা বলিয়া আমাদের জাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামাপদ যে কোন্ জাতি তাঁহার পরিচয় শ্যামাপদের পদবীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। যত কিছু গোলযোগ আমাকে লইয়া। আমি বলিলাম—আমি জাতিতে "নমঃশূদ্র"।

আমরা ফরাসে বসিয়াছিলাম। তাহাতে বৈঠকের উপর কয়েকটা বাঁধাহুঁকা ছিল। কর্ত্তামহাশয় তাঁহার একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া, হুঁকার জল ফেলিয়া দিবার আদেশ করিলেন। ফরাসের চাদরখানি তুলিয়া ধৌত করিতে আদেশ দিলেন। আমি বুঝিলাম যত কিছু ব্যাপার আমাকে লইয়া। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম—শ্যামাপদ ! আমি ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইতে চাই না। যদি কখন যাইতাম তাহা হইলে বিছানায় বসিতাম না। আমরা হিন্দু হইলে কি হয় ?—আমরা গোলামের গোলাম। আমরা পতিত ও নীচ জাতি। কেবল রায় বন্ধুর কথাতে ফরাসে বসিয়াছিলাম, নচেৎ কখনই বসিতাম না। তিনি আমার জাতি

জানিতেন। হুঁকা অপসারিত হইল। তাকিয়ার তলা দিয়া চাদর গুটাইতে আরম্ভ করিল। গতিক দেখিয়া শ্যামাপদ নীচে দাঁড়াইল। আমি পূর্ব্বেই নীচে নামিযা সরিয়া দাঁড়াইয়াছি।

কর্ত্তা রায় মহাশয় চটিয়া লাল হইয়াছেন। কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমার সহিত লেখাপড়া লইয়াই প্রথমে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সহাস্যবদন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি গতিক দেখিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। শ্যামাপদও আমার পশ্চাতে পশ্চাতে বাহির হইল। শ্যামাপদ যে, হুগলীর তারাপদ বাবুর পুত্র, একথা তিনি জানিতেন। আমি শ্যামাপদকে বলিলাম, আমার জন্যই তুমি অপমানিত হইলে? শ্যামাপদ বলিল—আমি অপমান ফপমান কিছু বুঝি না—তবে লোকটা যে নিতান্ত অভদ্র তাহা বুঝিয়াছি তত্রাচ ব্যাচারির জন্যই দুঃখ হইতেছে। আমি বলিলাম চটাইয়া কাজ নাই—লোকটা মন্দ কি! আমারই ব্যবহারটা ভাল হয় নাই। আমরা বাহির হইয়া আসিয়াছি—আমাদের যুবক রায়বন্ধু অতিশয় নম্রভাবে আমাদের নিকট আসিলেন—আমরা সেই বাড়ীর সম্মুখের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছি। এই বাড়ীর কর্ত্তা একজন যুবক, তিনিও রায়-বংশজ। তিনি আমাদের অপমানের কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদের হাত ধরিয়া নিজের বৈঠক-খানায় লইয়া গিয়া, ফরাসে বসাইয়াছেন। আমরা সেই রাত্র অতি আনন্দের সহিত যামিনীবাবুর বাড়ীতে কাটাইয়া দিলাম। অধিকন্তু তিনি "হরিপাল শ্রমজীবি-বিদ্যালয়ের" জন্য মাসিক

পনের টাকা করিয়া সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার উদার মত দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ছোট-লোকদিগের জাতিকে, আমাদের হুগলীর বিদ্যালয়ের মত শিক্ষা দেওয়া তাঁহার মতে অতি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে বলিলেন।

যামিনী বাবুর বৈঠকখানায় আরও কতিপয় যুবক আগমন করিয়া রাত্রে হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান ধরিলেন—কেহ কেহ দল বাঁধিয়া তাস খেলিতে আরম্ভ করিলেন। যামিনীবাবু তাঁহার লাইব্রেরী দেখাইয়া বলিলেন—মহাশয়! বলিব কি দেশের ছেলে, মেয়ে, যুবক যুবতী সকলেই উপন্যাস পড়িবার জন্য বিব্রত। উপন্যাস ছাড়া আর কোন পুস্তকই উহারা পড়িতে চায় না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও বন্ধু বান্ধবকে উপন্যাসের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভে সমর্থ হইতেছি না। আমি বলিলাম—দুদিনে, চারদিনে কিছুই হয় না। অনেক চেষ্টার পর যদি হয়। তবে কি না নভেল মাত্রেই কিছু মন্দ নয়। আপনি ভাল নভেল রাখিবেন। ক্রমে ক্রমে উহারা মন্দ ছাড়িয়া ভাল ধরিবে। তাহার পর ধর্ম্মগ্রন্থ, কৃষি, শিল্পবিষয়ক পুস্তকাদি সম্মুখে রাখিবেন। আমাদের হুগলীর শ্রমজীবী-বিদ্যালয়গুলি ও কৃষি-শিল্প-বিদ্যালয়-গুলি অনেক সাধনার পর গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের ছোট-লোক মহলে যে কি কষ্টে ভাবগুলির পুষ্টিবিধান করিতে হইয়াছে, ময়লা ধৌত করিয়া শ্রীমান করিতে হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব! একদিন দুইদিনে কিছুই হয় না। ফলটা শীঘ্র ফলে না। ফলে কিন্তু সবুরে!

যামিনী বাবু বলিলেন—"ঐ যে প্রকাণ্ড টেরি কাটা, দাড়ি ছাঁটা বাবুটীকে দেখিতেছেন—উনি ধোপা। এণ্ট্রেন্স ক্লাশ পর্য্যন্ত বিদ্যা। মাসিক পনর টাকা বেতন পান। কলিকাতায় থাকেন, সপ্তাহে একবার বাড়ী আসেন। মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখেন। বুঝেছেন! পতিতজাতির উন্নতিতে সুখ আছে, কিন্তু তাহারা উন্নতির নামে একশত পা পিছিয়ে পড়ছে—তাই দুঃখ হয়। আমার মনে হয়, ও সব জাতির মনের ভাব স্বতন্ত্র! ওঁরা কেরাণী বাবু হইয়া, ফিটফাট্ হইয়া থাকিতে ভালবাসেন। চশমা, ঘড়ি, ছড়ি নিয়ে জমিদারের ছেলের মতন—ফটিক বাবুর মত—ভদ্রতা দেখাইয়া সভ্য হইতে চাহেন। দেনায় মাথা ডুবিয়া রহিয়াছে। বাপ পিতামহের ভদ্রাসনটীও যায় যায় হইয়াছে। অন্নকষ্টের একশেষ হইয়াছে। কিছুদিন কাপড়কাচা ছাড়িয়াছিল। এখনও নিজে কাপড় কাচে না। বাবুর স্ত্রীও কাচে না—কাপড় কাচে ওঁর বিধবা মা ও ভগ্নী! সেইজন্য আমার ভয় হয়, গরীবের ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে দিলে, ঐ বাবুর মত পাছে ঘোঁড়ারোগ হইয়া দাঁড়ায়। আমি এই রকমের দশ পনর জনকে দেখাইতে পারি। সকলেই দরিদ্র ও পতিত জাতি। আপনি রাগ করিবেন না! ছোটলোকের ছেলেরা লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়া আরও অধঃপাতে যাইতেছে। ভদ্রের ছেলেরা কি—বাবু! তাহাদের উপর টেক্কা দিয়া চলিতে চায়! কেবল সভ্যতা, বিলাসিতা ও বাবুগিরী আর কুড়েমীটাও ওরা একচেটিয়া-ভাবে দখল করিতে চায়।"

আমি বলিলাম—"ওটা লেখাপড়া শিক্ষার দোষ নহে। লেখাপড়া শিক্ষার পদ্ধতির দোষ। বর্ত্তমান কেতাবী বিদ্যা যাহা স্কুল কলেজে চলিতেছে, তাহা কেবল গোলাম বানাইবার জন্য, প্রকৃত মানুষ করিবার জন্য নহে। পাশ করিলে পূর্ব্বে বড় বড় চাকরী মিলিত। এখন যদিও চাকরী মিলে, অতিকষ্টে, বেতনও পূর্ব্বের ন্যায় নহে,—কুকুরকে এক টুক্‌রা এঁঠো রুটি ছুড়িয়াদিবার মত মিলে। আমি ওরকম কেতাবী বিদ্যার আদৌ আদর করি না—এখন আমি নিজের জমিতে হালবাই, জল দিই, বাজারে ঝাঁকা মাথায় করিয়া তরিতরকারী বিক্রয় করি। 'আদর্শ, কথাটা বড় শক্ত কথা। আমি যদি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-ব্যাপদেশে নিজের হাতে পায়ে কাজ না করি, তাহা হইলে আদর্শ ঠিক্ থাকিবে না। "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়"—যিনি আদর্শ তাঁহাকে আদর্শের স্থান হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইলে চলিবে না। একটু বিচলিত হইলেই সকল অনুষ্ঠান নিমেষে পণ্ড হইয়া যাইবে —আদর্শের প্রতি অভক্তি হইবে, প্রতিষ্ঠান চুর্ণ হইয়া যাইবে। সেইজন্য আমাদের বিদ্যালয়েও ঐ রকম শিক্ষা দেই। বিদ্যালয়ের সকল ছোট, বড় ছাত্রকে নিজের হাতে চাষ করিতে হয়, শিল্প ও ব্যবসা শিক্ষা করিতে হয়। যার যাতে ভাললাগে, যার যাতে মন বসে তাহাকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়—মনের ভাব বুঝিয়া কাজ করান হয়। কেতাবী শিক্ষার সহিত অন্নসংস্থান-বিদ্যা হাতে কলমে শিখান হয়। তাহারা আমার মত, মোট মাথায় করিয়া হাটে বাজারে যাইতে লজ্জাবোধ করে না। ব্রস, চিরুণী দিয়া

মাথা আঁচড়ায় কিন্তু টেরি কাটে না—ছড়ি ঘুরাইয়া বড়লোক ও বিলাসী সাজে না। আমাদের বিদ্যালয়ের কারখানায় বিবিধ উদ্যানজাত ফুলের জল—এসেন্স, আতর প্রস্তুত হয় কিন্তু আমরা উহা ব্যবহার করি না ; যাহারা উহা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে তাহারাও উহার ব্যবহার অদৌ করে না—তাহারা ব্যবসা শিক্ষাকরে—অর্থ উপার্জ্জনের পথ আবিষ্কার করে।”

যামিনী বাবু আরও বলিলেন,—ঐ ধোপা বাবুটীর সহিত যিনি তাস খেলিতেছেন, উনি জাতিতে কুম্ভকার! এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, কুড়ি টাকা বেতনে কাজ করেন। বৃদ্ধ পিতা এখন হাঁড়ি পিটিয়া ছেলেকে বাবু করিয়া রাখিয়াছে। ও যদি নূতন উপায়ে ভাল ভাল হাঁড়ি, পুতুল প্রভৃতি গড়িতে পারিত, তাহা হইলে উহাদের ও দেশের দুঃখ দূর হইত! ভারি বাবু!—উৎসন্ন যাইতেছে। ওর মা আমার নিকট বড় কাঁদে, কি করিব বলুন? —আমি উহাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য ওদের গোলামী করি—যদি সৎপথে ফিরাইতে পারি! যদি ছোটলোকদের ছেলেকে লেখাপড়া শিখান একান্তই প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে স্কুলে পাঠাইলে চলিবে না। উহাদিগকে বাবু সাজাইলে চলিবে না—কাজের লোক করিবার উপায় করিতেই হইবে। সবাই চাকরী চায়। চাকরীর ঝোঁকটা, গুলির নেশা হইতেও যেন বেশী বলিয়া বোধ হয়! আপনি কি মনে করেন?

আমি বলিলাম—ওদের বড় দোষ নাই! দোষ শিক্ষার— শিক্ষাটাই যে বাবু ও বিলাসী করিতেছে। এই কারণেই সমাজে

অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা যে ছোটকাজ—তাহা ভদ্রেরাই বলেন। ভদ্র হইতে হইলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কুড়ে ও বাবু হইতে হইবে। স্কুলগুলোতে কুড়ে বাবু ও পরনির্ভরতা শিক্ষা দেয়—আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেয় না। যদি কৃষি, শিল্প শিক্ষার সহিত কর্ম্মঠ জীবন গঠন করিবার বন্দোবস্ত থাকিত, তাহাহইলে কেহই বাবুগিরী শিক্ষা করিতে পারিত না। আপনি ত বুঝেন,—চাষটা বড় ছোটলোকের কার্য্য! সুতরাং ছোটলোকেরা ভদ্রলোকের আদর্শটা শ্রেষ্ঠ ও চরম সভ্যতার উপায় বলিয়া ধরিয়া লয়। আমাদের বিদ্যালয় হইতে এবৎসর সাতজন সাঁওতাল, নয়জন ডোম, বারজন মুচি, চারজন কোঁড়া, তিনজন হাড়ী এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহারা লাঙ্গল বাহে, কেহ তাঁতের কাজ, কেহ ছুতারের কাজ, কেহ লোহার কাজ শিক্ষা করিয়া দক্ষ হইয়াছে। সংসারে এখন তাহারা কর্ম্মী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা নিজের নিজের পল্লীতে কেহ কেহ আমাদের আদর্শে বিদ্যালয় খুলিয়াছে। কেহ কেহ আমাদের বিদ্যালয়ে দেশ-হিত-কামনায় কার্য্যগ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের একজনও আদৌ বাবু নহে। আমি আমাদের শিক্ষক-ছাত্রগণের মধ্য হইতে দুই একজনকে এই গ্রামের "শ্রমজীবী-বিদ্যালয়ের" শিক্ষকরূপে দিতে পারি। যামিনীবাবু সোৎসাহে বলিলেন—তাহা হইলে আমি এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইতে পারি। শিক্ষকের খরচপত্র আমি নিজেই দিব। আপনি একজনকে পাঠাইয়া দিবেন। আমি বলিলাম—একজন সাঁওতাল এণ্ট্রেন্স

পাশ এবং কৃষি ও ছুতারের কর্ম্মে দক্ষ শিক্ষক পাঠাইয়া দিব। তিনি চৌকস লোক। কিছুই বলিয়া দিতে হইবে না। সব ঠিক্ হইয়া যাইবে।

বাবুদের তাস খেলা শেষ হইল। আমরা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলাম। কথায় কথায় তাঁহারা চাকরীর কষ্টের কথাই তুলিলেন। আমি আত্মপরিচয় দিবার পূর্ব্বে, যামিনী বাবু আমার আত্মপরিচয় দিয়া আমার কার্য্যপ্রণালী বিবৃত করিলেন। ধোপা বাবুটী বলিলেন—বলেন কি! আপনি একজন বি, এ, হইয়া নিজের হাতে লাঙ্গল ধরেন! বাজারে মোট মাথায় করিয়া যান?

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমি আমার জাতির কথা ও স্বাধীনপুরে বাসের কথা হইতে, ঘোষেদের বাড়ীর রাখালি পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনী তাঁহাদিগকে শুনাইয়া দিলাম। ধোপা ও কুম্ভকার বাবুটী অবাক্ হইয়া শ্রবণ করিলেন। আমি বলিলাম—আমি এম, এ, ও বি, এল, পর্য্যন্ত পড়িব—লাঙ্গল বাহিব—মোট মাথায় করিয়া বাজারে যাইব। আর আমাদের মত হীন অবস্থার জাতিকে শিক্ষা দিয়া, কর্ম্মঠ ও বিদ্বান জাতিতে পরিণত করিব। আমরা হীনজাতি, আমাদিগকে সভ্য হইতে হইবে কিন্তু বাবু ও বিলাসী হইলে চলিবে না। আমি দেখিতেছি বাবুতে কিছু নাই, কেবল দারিদ্র্যতা বাড়াইয়া সংসারের সর্ব্ব নিম্নস্তরে দাঁড় করাইয়া রাখে। আমি নমঃশূদ্র, আমাকে উন্নত হইতে হইবে কর্ম্মের দিক দিয়া। কঠোর পরিশ্রম দ্বারা আমাদের দরিদ্র পতিত সমাজকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। বাবুগিরী বা বিলাসীতার দ্বারা অধঃপতন

ব্যতীত আর কোন দিক্ দেখা যাইবে না। কেবল পতন! কেবল পতন! আমি নিজের কথা এবং আমার বিদ্যালয়ের কথাই বলিতেছি। আমাদের বিদ্যালয়ে, আমাদের ছোটলোক-জাতীয়-সমাজ উন্নত হইবে এ আশা আমার হইয়াছে। আমি দরিদ্র, ছোটলোক, ঘোষেদের রাখাল হারু! আমি নিজের সুখের দিকটা আদৌ দেখিতে পাই না। আমি আমার ছোটলোকদের সমাজকে উন্নত করিবার জন্য জীবনটা উৎসর্গ করিয়াছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইবই হইব। আপনাদের মধ্যে কি কেহ আমাদের এই পতিত সমাজকে উন্নত করিতে প্রয়াস পাইবেন? আমাদের কার্য্যটা নিঃস্বার্থভাবের নয়, কারণ আমি ছোটলোক হইয়া ছোটলোকের সমাজকে উন্নত করিতে যাইতেছি। আপনারা ভদ্র, আপনারা যদ্যপি আমাদের সমাজকে উন্নত করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে আপনাদের ত্যাগবলের পরিচয় প্রদান করা হইবে। কুম্ভকার বাবুটী ও ধোপা বাবুটী বুঝিলেন—আমি তাঁহাদের জাতীয় পরিচয় পাই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকেও ভদ্রের দলে চাপিয়া ধরিয়াছি। কোন লোককে অসম্মান দেখান আমার স্বভাব নয়। সকলকেই সম্মান করি, কিন্তু মনে মনে দুঃখ হয়। মনের ভাব গোপন করি। কুম্ভকার বাবুটী বলিলেন—হারাধন বাবু! বলিতে কি—আমার এক্ষণে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। আমি জাতিতে কুম্ভকার, নিজের ব্যবসা শিখি নাই, একটু কেতাবী বিদ্যা শিখিয়াছি মাত্র। এখন দু কুল যাইতেছে। চাকরিও ভাল পাইলাম না, হাঁড়ি গড়িতেও জানি না! এখন

অন্য ব্যবসা শিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের সময়ও নাই—অভাব ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি বলিলাম—অবকাশকালে জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা করুন। ইহারই উন্নতিকল্পে চিন্তা করুন। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। তিনি বলিলেন—এই যামিনীবাবুর কথায় তাহা আরম্ভ করিয়াছি। হাঁড়ী, পুতুল ও চিনেমাটির পুতুল, বাসন প্রস্তুতের উপায় শিক্ষা করিতেছি। কিছু কিছু পারি, বৎসরের মধ্যে পারিব। দেখি, ভগবান কি করেন। ঠকিয়া তবে শিখিতেছি।

বৈঠক ভঙ্গ হইল। আমরা আহারাদি করিয়া রাত্র একটা পর্য্যন্ত নানাবিধ দেশহিতকর, সমাজহিতকর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। যামিনী বাবু আমাদের নিকটে ফরাশ বিছানাতেই শয়ন করিয়া রহিলেন।

পরদিন হরিপাল-"শ্রমজীবী বিদ্যালয়" পরিদর্শন করিলাম। আমাদের ছোটলোকের ছেলেরাই তথায় পড়ে। এই গ্রামেরই একজন শিক্ষক তথায় নিযুক্ত আছেন। তিনি জাতিতে 'গোপ'। আমাদের উপদেশ মত শিক্ষা আদৌ হইতেছে না। শিক্ষক মহাশয়, শ্রমজীবিগণের জন্য যে প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা নিজেই অবগত নহেন। লোক দ্বারা, পত্র দ্বারা বারংবার উপদেশ প্রদান করিয়াও কিছু হইল না। বেতনের জন্যই তিনি পরিশ্রম করেন তাহা বুঝি, কিন্তু যে জন্য বেতন দেওয়া হয় তাহার কথা কি শিক্ষক মহাশয়ের স্মরণ থাকে! ছাত্রদিগকে কি উপায়ে শিক্ষা দিলে, এই নূতন ধরণের বিদ্যালয়ের কার্য্য এক রকম মোটামুটী চলিবে, তাহা তিনি চিন্তা করিবার সময় প্রাপ্ত হন না!

নিজের গার্হস্থ্য জীবনের কার্য্য, এমন কি যাহা না করিলেও চলে, তাহাতে প্রচুর সময় প্রদানের অবসর হইয়া থাকে। এই জাতীয় উন্নতিকর মহান্ বিদ্যালয়ের হিতচিন্তায়, বিন্দুমাত্র সময় ব্যয় করাকে, তিনি সময়ের অপব্যয় বলিয়াই বোধ করেন। দেখিলাম তিনি টাকা কয়টীর প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ করেন। কিন্তু কি জন্য তাঁহাকে বেতন প্রদত্ত হইতেছে, তাহার প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। ছেলেদিগকে যে সময়টুকু কেতাবী বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহার মধ্যেও আন্তরিকতা আদৌ নাই। সে সময়টুকু বৃথা ব্যয় হইয়া যাইতেছে। শিক্ষার পদ্ধতি, আমাদের নিয়মানুমোদিতও নহে। ছেলেরা সকলে সমান নহে, শিক্ষা দেওয়াটা সহজও নহে। কেতাবী-বিদ্যাশিক্ষার—বিদ্যালয়েরও মতও নহে অথচ আমাদের আদর্শাবলম্বনেও নহে। কেমন এক উদ্ভট ভাবের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহাতে দুকুল নষ্ট হইতেছে। না হইতেছে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা, না হইতেছে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা! প্রকৃত সত্য কথা বলিতেহইলে বলিতে হইবে, শিক্ষক মহাশয় উদাসীন ভাবেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, অল্প সময়ে অধিক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, একজনকে শিক্ষা দিলে, সেই সঙ্গে সকল বালকদের শিক্ষা হইবে, তাহার চিন্তাই তাঁহার মনোমধ্যে আদৌ উদয় হয় না। মোটের উপর ছেলেদের শিক্ষা কিছুই হইতেছে না। সুতরাং তাহাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফল ত কিছুই হইতেছে না! অধিকন্তু অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতেও তাহারা

পিছাইয়া পড়িতেছে। ইহার ফল অতি ভীষণ হইতেছে। ছাত্রদের আস্থা ও ভক্তি, এ বিদ্যালয়ের উপর বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। গণিত শিক্ষার প্রণালী তিনি আদৌ অবগত নহেন। বোর্ডের গাত্রে খড়ি পাতিয়া শিক্ষা দেওয়াটার উদ্দেশ্য কি? ইহাতে যে কি শুভ ফল ফলে, তাহা তিনি একেবারেই যে অজ্ঞ তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি উহাতে পরিশ্রম হইবে বলিয়াই সম্ভবতঃ করেন না।

তিনি শিক্ষার সময়েও অবসর অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অনেকটা সময় গল্প গুজবেই কাটিয়া যায়। স্কুলের সময় টুকু নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তত্রাচ তিনি, সেই অল্প সময় টুকুর অযথা ব্যবহার দ্বারা কাটাইয়া দেন। যে কার্য্যে পরিশ্রম নাই, তাহাই তিনি যত্নসহকারে গ্রহণ করেন। ছেলেদিগকে কিছু লিখিতে বলিয়া, তিনি নিজের কাজে চলিয়া যান। তাঁহার নজর—কি করিয়া কোন উপায়ে কতটুকু সময় অবকাশ লইতে পারেন। তিনি প্রধান শিক্ষক, তাঁহার অধীনে আরও দুইটী শিক্ষক আছেন—একজন মাইনর ও একজন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁহারা কেতাবী বিদ্যা যৎসামান্য শিক্ষা করিয়াছেন—তাঁহারাও আমাদের পতিত জাতীয়। তাঁহারা যে প্রকার কায়দায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন সেই প্রথায় শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা উপযুক্ত নহেন। তাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয়ের মত শিক্ষা দিতে পটুও নহেন। নিম্ন শিক্ষক মহাশয়দ্বয় নিজেও আর শিক্ষা করিতে চাহেন না। তাঁহাদের বিদ্যা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। আর কিছু শিক্ষার

আবশ্যকতা নাই—সম্ভবতঃ এই ধারণা জন্মিয়াছে। প্রধান শিক্ষক তাঁহাদিগকে শিক্ষার প্রণালী শিক্ষা দিয়া, কর্ম্মী করিয়া লইতে পারেন না। জাতীয় বিত্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য না পড়াইয়া, ঠিক কেতাবী শিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্য পড়ানই যে ভাল, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা পরিশ্রম করেন এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল নাই। ছাত্রদের মনে জাতীয় শিক্ষার রং ধরাইয়া দিতে পারেন না। মোটের উপর ছাত্রগণের শিক্ষা কিছুই হইতেছে না। মানচিত্র, গ্লোব, বোর্ড-গুলির আবশ্যকতা কি—তাহা বুঝেন না। কি সাহিত্য, কি ইতি-হাস, কি ভূগোল, কি গণিত কিছুই হইতেছে না—শিক্ষার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদিগের মাথা খাটাইয়া লইয়া, শিক্ষার ফল প্রদর্শনের উপায় আদৌ দেখা যায় না। ছাত্রগণ মুখস্থ করিতে চায়। তাহাদিগকে তাহাই করিতে দেওয়া হইতেছে। বুদ্ধি খাটাইয়া জ্ঞান, কেন্দ্রের বিকাশসাধনের পন্থা আদৌ দেখান বা শিখান হয় না। কাজেই সব শিক্ষা পণ্ড হইয়া যাইতেছে। উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে জাতীয় বিত্যালয়ের কার্য্য আদৌ অগ্রসর হইতেছে না। শিক্ষকগণের অভিযোগগুলি অতি চমৎকার। কেহ বলেন, বিত্যালয়ে ভাল বেঞ্চ, চেয়ার, টেবেল নাই। কেহ বলেন, শিক্ষকগণের অবকাশ নাই—স্কুলের পাঁচঘণ্টার মধ্যে একঘণ্টা অবকাশ চাই। ছেলেরা বোকা, কিছু করে না। গণিত শিখিতে পারে না, ইংরাজীতে তরজমা করিতে পারে না, ড্রইং জানে না। পূজাপর্ব্বে, গ্রীষ্মাবকাশের ছুটী বৃদ্ধির আবশ্যক

ইত্যাদি তাঁহাদের অভিযোগ। তা ছাড়া বেতন বৃদ্ধির কথাটা সর্ব্বোপরি। অভিভাবকগণ বলেন—ছেলেদের পড়া ভাল হয় না। অঙ্ক ভাল হয় না। এত বেশী বেশী পড়া দেওয়া হয় যে, সে দৈনিক পাঠ, ছেলেদের পড়া অসম্ভব। ছেলেদের অভিভাবকগণ সেই পড়া শিক্ষা করিতে পারে কিনা সন্দেহ। ইংরাজী শিক্ষা মোটেই ভাল হয় না। জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াইয়া কি লাভ, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

ছাত্রদেরও অভিযোগ আছে। তাহারা দরিদ্র, মূল্য দিয়া রাশি রাশি পুস্তক ক্রয় করা তাহাদের অভিভাবকগণের ইচ্ছা নয়। কেহ বলে পড়ার জন্য ভীষণ প্রহার সহ্য করি। অথচ আমি যে কেন পড়া পারিতেছি না, তাহার কারণ বলিলেও আমার শিক্ষার মত শিক্ষা আমি পাই না। যে কারণে ছাত্রগণ পড়া পারে না সেই কারণ, ছাত্রদের ভাব বুঝিয়া, ধরিয়া লইয়া যে ব্যক্তিগতভাবে তাহাদিগের শিক্ষা দেওয়া হয় না তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। কি কারণে এই বালক গণিতের অঙ্ক কসিতে ভুল করিতেছে, তাহা শিক্ষক ধরিয়া ফেলিয়া বুঝাইয়া দেন না। সাহিত্যক্ষেত্রেও তদ্রূপ। সাহিত্যের খুটিনাটি, ব্যাকরণের সাহায্য লইয়া আলোচনা করা হয় কিন্তু সাহিত্য পাঠে কি বুঝিলাম, কি শিক্ষা পাইলাম, তাহা কোন ছাত্রই বলিতে পারিবে না। সাহিত্যের মধ্যে বিভিন্ন ভাবপূর্ণ, বিভিন্ন উপদেশপূর্ণ যে সকল পাঠ আছে, তাহার মর্ম্ম, তাহার ফলাফল, ছাত্রেরা বুঝে না। তাহারা গদ্য, পদ্যময় পাঠ পড়ে কিন্তু কেন পড়ে, উহা পাঠে কি শিক্ষা পাইল,

তাহা তাহাদের মধ্যে কি কেহ বলিতে পারে? শিক্ষার মধ্য দিয়া সাংসারিক, সামাজিক, কৃষি, শিল্প বাণিজ্যের যে কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা তাহারা অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। শিক্ষাটা একেবারে কেতাবী ধরণের হইলেও, তাহারও ফললাভ হইতেছে না। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে আসে—পড়ে—শিক্ষা করে কিন্তু কি পড়ে, কি শিক্ষা করে তাহারা তাহা আদৌ বুঝিতে পারে না। আজ তাহারা স্কুলে আসিয়া কোন বিষয়ে কতটুকু শিক্ষা করিল, তাহারা তাহা মোটেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের আগ্রহ, শিক্ষার প্রবৃত্তি হ্রাস পাইতে থাকে। এই বিদ্যালয়ে পড়িলে ভবিষ্যৎ আশা কি, তাহা তাহারাও বুঝে না, তাহাদের অভিভাবকগণও বুঝে না, অথচ বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে, ছেলেরা পড়িতে আসিতেছে, শিক্ষকগণও পড়াইতেছেন। কলের মত, প্রাণহীন যন্ত্রের মত কাজ চলিতেছে। শিক্ষার ফল কি? প্রয়োজন কি? সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব কি? এই শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি? কেহই বুঝেন না। বুঝিবার মত—বোঝাইবার মত করিয়া শিক্ষা দীক্ষা দিবার আগ্রহও নাই—ইচ্ছাও নাই—আন্তরিকতা নাই। বেতনের টাকা কয়টা হইলেই হইল! তাঁহারা কীদৃশ শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা জাতীয় জীবন উন্নত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন—তাঁহারা কোন্ বিদ্যালয়ের শিক্ষক—এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি—উদ্দেশ্য-গুলি কীদৃশ উপায়ে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন, তাহার চিন্তামাত্র নাই। অথচ তাঁহারাই জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক! এ রহস্য কে উদ্ঘাটন করিয়া দিবে! কর্ত্তব্য জ্ঞানে অন্ধ! এ

বিদ্যালয়টী যে সাধারণ বিদ্যালয় হইতে কোন কোন অংশে ভিন্ন—সেই ভিন্ন ভাবটুকুই যে এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব, তাহা কেহই একবারও চিন্তা করেন না।

এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য কি? শিক্ষা দীক্ষার পন্থা বর্ত্তমান সাধারণ স্কুলের শিক্ষার পন্থা হইতে কতদূর পৃথক, তাহা বুঝিয়া চলিলে কি আর আমাদের ভাবনা ছিল!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইল, আমাদের শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ছাত্রগণকে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরূপে না পাঠাইলে, দেশের মধ্যে এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে কুভাব ছড়াইয়া পড়িবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা পড়িবে। ছাত্রসংখ্যা বর্ত্তমানে আশীটী। গড়ে উপস্থিত ষাটটী। ছাত্রদত্ত বেতন হইতে শিক্ষকগণের ও বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। যামিনী-বাবু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করেন। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিতেছেন কিন্তু তিনি কি বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিবেন, সেই ভাবনাই আমার হইয়াছে। একটা বিদ্যালয় দ্বারা দেশের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার ভাবও ছড়াইয়া পড়ে না। গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় জাতীয় শিক্ষার ভাব ছড়াইতে হইবে কিন্তু শিক্ষক চাই। নতুবা সকলি পণ্ড হইবে। একটা বিদ্যালয় চালান সহজ কিন্তু ঐ রকমের দশটা চালান সহজ নহে। কিন্তু আমাদিগকে দশটা বিশটা বিদ্যালয় চালাইতেই হইবে। অর্থ বল নাই, লোকবল নাই, শিক্ষক মহাশয়গণের আন্তরিকতা নাই। শিক্ষক তৈয়ারি করিয়া—নর্ম্মাল স্কুলের মত পণ্ডিত করিয়া,

তবে সেই ছাত্র-শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার কার্য্য চালাইতে হইবে। নচেৎ দায়িত্বজ্ঞানহীন শিক্ষকগণের দ্বারা এ কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে। আমাদের দেশবাসীগণের হৃদয়কেন্দ্র, যে শিক্ষা দীক্ষার বলে আন্দোলিত হইতেছে, সেই আন্দোলন ধাক্কায় ধাক্কায় সরাইয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভাবে, ভারকেন্দ্র দোলাইয়া দিতেই হইবে। যেমন করিয়াই হউক ইহা করিতেই হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি তাকাইয়া—তাঁহাদের প্রতি মায়া মমতা করিয়া, এত বড় একটা অনুষ্ঠানকে পণ্ড করিতে পারি না। হৃদয়কে দৃঢ় করিতেই হইবে। কঠোর পন্থা কোমলভাবে চালাইতেই হইবে। শিক্ষকগণের নিজ নিজ বাসনা অনুযায়ী কর্ম্মে চলিতে দিলে যে এ কাজ আদৌ চলিবে না তাহা বুঝিতেছি। উপায় আছে, না থাকিলেও উপায় করিয়া লইতে হইবে। জাতীয় বিদ্যালয়ের ভাব বজায় রাখিতেই হইবে। ইহার বিশেষত্ব অক্ষরে অক্ষরে ঢালিয়া দিয়া ইহাকে উন্নত করিতেই হইবে। নচেৎ সমগ্র কর্ম্মটা পণ্ড হইবে। সাধারণের মনে, কুভাব একবার বসিয়া যাইলে উন্নতির আশা আদৌ থাকিবে না। সাবধানে কার্য্য করিতেই হইবে। সমষ্টির হিত কামনা করা চা-ই চাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিতেই হইবে।

হুগলী জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ দেখিয়া আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট পল্লীগুলি পর্য্যবেক্ষণ সমাপ্ত করিব মনে করিলাম। ধীরে ধীরে হুগলী জেলা অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমান জেলার মেমারি ষ্টেশনে আসিয়া রেলে চাপিয়া হুগলী প্রত্যাগমন করিব। যামিণী

বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা সমাধা করিয়া আহারাদি সমাপ্তের পর, আমরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিলাম। ধীরে ধীরে পথ চলিয়া পল্লীর পর পল্লী দেখিতে দেখিতে, গ্রামের লোকের অবস্থা—ছোট লোকদের অবস্থা—বিদ্যালয়ের অবস্থা, পথ, ঘাট, জলাশয়, হাট, বাজার, কৃষি, শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা দুই জনে চলিয়াছি। ছোট ছোট চাষার গ্রাম। বড় বড় পল্লী, একটীর পর একটী করিয়া, দিনের পর দিন ধরিয়া দেখিয়া চলিয়াছি। বন্ধু বান্ধবের অভাব—বাসস্থান বা অন্নাভাব একদিনও হয় নাই। আমাদের দেশ দরিদ্রের দেশ বটে—প্রবাসীগণ অসভ্যের দেশ বলেন! কিন্তু আমরা আমাদের দেশের ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠিলাম। যথার্থ ই আমাদের দেশ মা-অন্নপূর্ণার দেশ—যথার্থ ই দরিদ্র নারায়ণের দেশ। এমন দেশের মত দেশ স্বর্গেও নাই। আমরা পল্লীর পর পল্লীতে ভ্রমণ করিতেছি—আত্মীয় নাই, কুটুম্ব নাই, পরিচিত বন্ধুবান্ধব নাই। সুতরাং আমার নিজের দেশে প্রবাসীর ন্যায় চলিয়াছি। অথচ প্রত্যেক গ্রামে আমরা ভাই পাইয়াছি, মা পাইয়াছি, বন্ধুবান্ধব পাইয়াছি, আদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি। দশজন গ্রামবাসী আমাদের সহিত মন খুলিয়া কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পল্লী দেখিতে আসিয়াছি। সকলেই আমাদিগকে নিজ নিজ বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। যাঁহার বাড়ী গিয়াছি তিনিই পরম আত্মীয়ের ন্যায় আমাদের শয্যা, জল, অন্ন প্রভৃতির সুন্দর আয়োজন করিয়া দিতেছেন। গ্রামের দশ বিশ জন লোকে

আমাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য কতই না ব্যস্ত। দেশের শিক্ষা—কষ্ট—অর্থাভাবের কথা লইয়া কত রকমের কত কথাই না হইতেছে। কি আনন্দ! আমাদের দেশটা কি এত উদার! এত মহৎ! এত সুন্দর! আমরা তাঁহাদের পল্লী দেখিতে আসিয়াছি, এ আনন্দ আর তাঁহাদের ধরেনা। কত বাড়ী নিমন্ত্রণ হইতেছে—কত লোকের সহিত এক দিনের মধ্যে আলাপ হইয়া যাইতেছে। একি অসম্ভব নয়? আমার মনে হয়, আরব্য উপন্যাসের গল্প অপেক্ষাও আশ্চর্য্য! এমন কি দেশের লোক যে অতিথিসৎকারে এতাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করে—তাহা ভাবিয়াই উঠিতে পারি নাই—এ দেশের লোক দেবতারও উপরে। চাষার পল্লী মধ্যে গিয়াছি—তথায় ভদ্র লোকের নাম গন্ধ নাই। তাহারা আমাদিগকে কত আদর করিয়াছে—এ আদরের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম যেন মূর্ত্তিমান হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হইল। তাহারা দুঃখ দৈন্যের কথা, জমি জমার কথা, জমিদারের কথা যে যত বলিয়াছে ভদ্রপল্লীস্থ ভদ্র বন্ধুগণের নিকট তাহার একাংশও শুনিতে পাই নাই। সকল কৃষক এখন কৃষিকার্য্য করে—ইহারা সুখী, কিন্তু দুঃখের বোঝা ক্রমশ জমিদারেই চাপাইয়া দিতেছেন। মহাজনের কল্যাণে দেশটা ডুবিতেছে।

কৃষকগণের উপরেই যত অত্যাচার উৎপীড়ন। প্রলোভনের মাত্রা অত্যধিক। দেখিলাম, প্রতি ভদ্রপল্লীর বড় বড় বাড়ীগুলির মধ্যে অনেকগুলিই 'তালা'বন্ধ—অনেক মধ্যবিত্তের বাড়ী 'তালা-চাবি' বন্ধ। সদর দ্বারের পথটী ঘাসে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

দরজায় লতা জড়াইয়া উঠিয়াছে। উইপোকায় কাঠের কপাট খাইয়া জীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কপাটের ফাঁক দিয়া বাড়ীর ভিতর দেখা যাইতেছে। জঙ্গলে পূর্ণ—ভূতের বাড়ী। ঐ সকল মধ্যবিত্তের গৃহগুলির চালে খড় নাই, গলিয়া পড়িতেছে। বাড়ীর আব্রু রক্ষার জন্য যে প্রাচীর এতদিন বাড়ীটাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, আজ আর সে বাড়ীর আব্রু রক্ষা করিতে পারিতেছে না। ঘাসে, বনলতায় বাড়টীকে এক অপূর্ব্ব বেশে সাজাইয়া রাখিয়াছে। ছোটলোকের পাড়ার মাঝে মাঝে 'ক্যাঁৎরাপুরী' হইয়াছে। কেবল ভাঙ্গা দেওয়াল—বৃষ্টির জলে খসিয়া পড়িতেছে। পুষ্করিণী আছে, বাঁধাঘাট আছে, পুকুর পানায়, দামে পূর্ণ। গ্রাম্যপথ প্রায় বনাবৃত। বাগানের শোভা নাই, আগাছায় পূর্ণ হইয়া অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। বাবুদের জমি চাষারা চষিতেছে। অনেক জমি গর-আবাদি অবস্থায় পড়িয়া আছে। যাঁহারা পল্লীকে শ্রীমান করিয়া রাখিতেন তাঁহাদের বংশধরগণ গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বাস করিতেছেন। যা'রা অকেজোলোক তা'রাই দেশে আছে—যাঁ'রা কাজের লোক বলিয়া দেশ মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পল্লী নিকেতনে আর তাঁহারা থাকেন না। যাঁহাদের পুষ্করিণীর জল চল্ চল্ করিত, কাকের চক্ষুর মত জল, সেই জল দেশের চাষাভূষা গরিব গুরবারা পান করিত। তাঁহাদের ফুলের বাগান, ফলের বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত—তাঁহাদের পল্লী ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাগানে বাঘের বাসা হইয়াছে, বনে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; দিনের বেলায় একাকী রাস্তা চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলে

মনে হয় পল্লীতে বুঝি লোক নাই! কোন কোন পল্লীতে সন্ধ্যার পর একটীও মানবের শব্দ শ্রুত হয় না। ছোট লোকেরা বাবুদের বাড়ীতে খাটিয়া খাইত। বাবুরা চলিয়া গিয়াছেন এখন কোথায় যায়! কাজেই চটের কলে, কাপড়ের কলে, কাগজের কলে মজুরী করিয়া সংসার প্রতিপালনের জন্য গ্রাম ছাড়িয়াছে। তাহাদের ঐ ভাঙ্গা ঘর, দেয়াল, বাপ পিতামহের ভিটাটা পড়িয়া রহিয়াছে। যাহারা নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়া আছে তারা বলে—

"সাঁঝের বাতি পাবে আমার সাত পুরুষের ভিটে।"

যদি কখন দিন ফেরে তবে তাহারা এই ভিটাতেই সুখ পাইবে। তাহারা সহরের চাকচিক্যে ভূলিয়া যায় নাই। বাবুরা তাহা-দিগকেই অকেজোর দল বলেন। বাস্তবিক পল্লী-ভ্রমন-ব্যাপদেশে দেখিলাম—এই অকেজোগুলাই কাজের, তাহারাই পল্লীর ভূষণ। দয়া, মায়া, আতিথেয়তা, পরোপকার প্রভৃতি পল্লীবাসীর গুণগুলি ইহারাই অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। মনের বল প্রচুর রহি-য়াছে। একবেলা শাক-ভাত খাইয়াও ইহারা যেন পূর্ণ স্বাধীন। অধিকাংশপল্লীগুলিকে এই অকেজোর দলের লোকেই সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা পল্লী ছাড়িয়া সহরে বাস করিতেছেন বাস্তবিকই তাঁহারা দেশের জঞ্জাল। এই পল্লী ঝাঁট দেওয়া ময়লা গুলাই, দেশের মধ্যে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছেন। এই দলের লোকই পল্লীজননীর নিন্দুক। ইঁহারাই ম্যালেরিয়ার সংস্কারক! ইঁহারা কাগজের উপর কালির আঁচড় পাড়িয়া দুনীয়ায় সকল কাজ 'ফতে' করিতে চান্। পল্লী মধ্যে হৃদয়বানের

অভাব নাই। ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়াও তাহারা এখন বাঁচিয়া আছে। এখন তাহারা যেমন তেমন করিয়া চাষ করিয়া দুঃখের ভাত সুখে করিয়া খাইতেছে। পল্লী ত্যাগ করিয়া, যে ছোট লোক বা কৃষকের দল, কলে কাজ করিতে গিয়াছে—তাহারা বাবু, বিলাসী হইয়াছে—আর হা অন্ন! হা অন্ন! করিতেছে। আমাদিগকে ক্ষুদ্র পল্লীর কৃষকগণও যথেষ্ট সমাদর করিতেছে। বিলাত বা আমেরিকা হইলে এ প্রকার সমাদর মিলিত না। যাঁহারা আমাদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিতে চাহেন—তাঁহারা অশিক্ষিত অসভ্য কৃষকের সভ্যতার নিকট পরাজিত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস। সভ্যতা কি বস্ত্র? না কল কারখানা? না যুদ্ধোপকরণ? তা যদি হয়, তাহা হইলে এই কৃষকগণ নিশ্চয়ই বর্ব্বর! তা যদি না হয়, তবে ইহারা নিশ্চয় সভ্য! সভ্যতার মাপ কাটী কেমন—কে জানে! আমরা যতই পল্লী হইতে পল্লীতে গমন করিতেছি ততই আমাদিগকে দেশের জন্য আকুল করিয়া তুলিতেছে। এ যে সোনার দেশ! স্বর্গের স্বর্গ! মা অন্নপূর্ণা প্রতি পল্লীতে পল্লীতে বিরাজিতা। তবু ভাণ্ডার লুঠ হইয়াছে—হইতেছে—তত্রাচ পল্লী-মায়ের মূর্ত্তি—সজীব মূর্ত্তি শত সহস্র দেখিতেছি। পল্লী রমণীগণ সাক্ষাৎ ভগবতী। স্নেহ, করুণা, দয়ায় ঠিক—মাতৃ-মূর্ত্তি। "এমন দেশটী আর কোথাও নাই" —'এ সকল দেশের সেরা'। ইঁহারা দৈন্যের মধ্যে, দুঃখের মধ্যেও অতিথির পূজা, দেবতার ভোগের মত, আদর ও ভক্তির সহিত দিতে-ছেন। শিক্ষার অভাব সর্ব্বত্র পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। গ্রামের মধ্যে যিনি একটু লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তিনিই বিদেশে চাকরীর চেষ্টায়

বাহির হইয়াছেন। পল্লী শূন্য! কোন কোন গণ্ড গ্রামে বিদ্যালয় আছে, লোক সংঘট্ট আছে, দলাদলি আছে, মোকদ্দমা মামলা আছে—খুন জখম আছে—ঠেঁটা বাট্‌পাড় আছে। সেগুলা সহরের বাচ্ছার মত হাব্‌ভাব্ দেখাইতেছে। বহু গ্রামের, বহু পল্লীর নামোল্লেখ করিয়া প্রয়োজন নাই। এই সুদীর্ঘ পল্লী পর্য্যটনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি—তাহাতে মনে হয়, আমার বি, এ; পরীক্ষা অপেক্ষা বেশী শিক্ষা হইল। গণ্ড গ্রামগুলির অবস্থা বিষাদময়! উন্নতির লেশ মাত্র নাই। সেখানে হয় একটা সখের থিয়েটার, না হয় একটা যাত্রার দল আছে। তাস, পাশা, দাবা খেলা চলিতেছে। ময়রার দোকানে, পোষ্ট-অফিসের রোয়াকে বুড়োর দলের আড্ডা। যুবকগণের আড্ডা আরও ভীষণ। সেখানে হয় না এমন কিছুই নাই। স্নানের ঘাটে সাবানের ছড়াছড়ি!

সন্ধ্যার পর—আড্ডায় আড্ডায় নিন্দা, কুৎসা ও পরচর্চ্চা হয়। যে গণ্ড গ্রামে গিয়াছি, তথায় ইহার অভাব লক্ষিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যেও মহৎ প্রাণতা বিদ্যমান আছে। দেশের মঙ্গল কামনায়, যুবকগণের যথেষ্ঠ উৎসাহ দেখিয়া মনে হয়, এ কোথায় আসিলাম, বিলাসের মধ্যে এমন দেবভাব! অনেক যুবক হীরার টুকরা, মুর্ত্তিমান কর্ম্মী। দরিদ্র নারায়ণের পূজা ইহারাই করিতেছে। এই প্রকার গণ্ড গ্রামে আমরা অনেকগুলি যুবক বন্ধু পাইলাম। তাহারা বৃদ্ধদের মৌরসী পাট্টার খাতির করিতে অনিচ্ছুক। স্বাধীন চিন্তায় তাহাদের মস্তিষ্ক পূর্ণ। ইহারা দেশকে নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

হৃদয় উদার ও প্রশস্থ। ইহাদের কথার মূল্য আছে—কপটতা নাই। খোলাখুলিভাবে বেশ কথা বলে। ইহারা ক্ষুদ্র পল্লীবাসীর মত হীম-শীতল নহে। যদি দেশের মধ্যে কিছু সৎ-অনুষ্ঠান করা যায়—তাহা হইলে এই সকল গণ্ড গ্রামেই হইবে। ক্ষুদ্র পল্লী অপেক্ষা, এই প্রকার গণ্ড গ্রামেই অধিক কাজ পাইয়াছি। এই সকল যুবকগণই নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবে, এমন সুনিশ্চিৎ ভরসা পাইতেছি। আমরা থাকিতে থাকিতেই, দুই তিন দিবসের মধ্যে, তাহারা বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান করিয়া ফেলিল, দেখিয়াছি। এখন সেই সকল গণ্ডগ্রামে, সেগুলি টিকিয়া আছে। যেখানে দন্ধ, সেই খানেই জয় হইতেছে। যেখানে শান্তি—যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, সেখানে বড় একটা কিছু করিতে পারি নাই। তথায় দয়া, ধর্ম্ম আছে—কিন্তু উৎসাহ নাই। অভাব অভিযোগ আছে, কিন্তু প্রতিকারের উপায় নাই। তাহারা মৃতের মত পড়িয়া আছে। তথায় সমাজ উন্নতিকর কোন অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠানের সম্ভব দেখিলাম না। তাহারা মামুলী চাল ছাড়িতে নারাজ। তাহারা পুরাতনেরই আদর করে, পুরাতনকেই আঁকাড়িয়া ধরিতে চায়, নূতন কিছু সেখানে গড়া সহজ হইলেও—জলের তিলকের মত—অস্থায়ী হইয়া পড়ে। যদি কিছু করা যায়, তাহা হইলে এই সকল গণ্ডগ্রামেই হইবে। শান্তিময় ক্ষুদ্র পল্লীতে হইবে না। সেখানে সাড়া পাই নাই। মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে কি হয় বলা যায় না—এখন সে সময় আমাদের দেশে আইসে নাই। প্রতি জেলার গণ্ডগ্রাম গুলিতেই

সাড়া উঠে—ঝঙ্কারে প্রতি-ঝঙ্কার পাই। প্রাণের সাড়া পাই! তাহারা মৃতের মত, জড়ের মত নয়! দেশের মঙ্গল গণ্ড গ্রাম হইতেই উঠিবে। ক্ষুদ্র পল্লী হইতে মঙ্গল শঙ্খ বাজিতে, এখন অৰ্দ্ধ শতাব্দী লাগিবে, কি আরও বেশী লাগিবে বলিতে পারি না। গণ্ড গ্রামের যুবক বন্ধুগণ—দেশের মঙ্গল বুঝে। তাহারা আদর্শাভাবে গন্তব্যপথ দেখিতে পাইতেছে না। কর্ম্মময় জীবন কালের উপযুক্ত অভিনয় করিতে পায় না—তাই বুঝি তাহাদের বিলাস বাসনা প্রবল! একটা কিছু না করিলে জীবন কালটা কাটিবে কি করিয়া!

ক্রমে ক্রমে যতই মেমারির নিকটবর্ত্তি হইতেছি—রেল রোডের নিকটে আসিতেছি ততই পল্লী-বৈচিত্র্যও হ্রাস পাইতেছে। তাই মেমারির মধ্যে কেমন একটা সহুরে সহুরে গন্ধ ছাড়িয়াছে। কাহার সহিত কাহার তেমন প্রণয় নাই—মিলা মিশা নাই। কেমন একটা থাক্-ছাড়া গোছের হইয়া পড়িয়াছে। অতিথির প্রতি আস্থা নাই। দেশের প্রতি ভক্তি নাই। দেশের হিত চিন্তায় সাড়া নাই। আপনাকে আপনি লইয়া ব্যস্ত। এ স্থানে যে কিছু হইবে সে আশা নাই। এরা মৃতও নহে, ঠিক জীবিতও নহে—যেন মানব জীবনের একটা অদ্ভুত অবস্থা! এখানকার লোকে সব জানে, সব বুঝিয়া বসিয়া আছে—দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ এই ভাব। তাহারা এক প্রকার ভিন্ন জীব-জগতে বাস করে। এ জগতের নয়, পল্লী বা গণ্ড গ্রামের নয়, সহরেরও নয়—তাহারা লোকালয়ের মধ্যে থাকিয়াও যেন দেশের বাহিরে বনে বাস করে।

ধীরে ধীরে যে এমন ক্রম পরিবর্ত্তণ দেখিব—মানব চরিত্র পাঠ করিব এমন আশা ছিল না। আমাদের ভ্রমণটা ক্রমশঃ আমাদিগকে জ্ঞানী করিয়া তুলিতেছে। পল্লী বৈচিত্র্যের, উত্থান পতনের, এমন সুস্পষ্ট চিত্র যে আমরা দেখিব ইহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তারাপদ বাবুর কল্যানে, আমরা সে জ্ঞান পাইতেছি। তাহা কোন ডিগ্রী পরিক্ষায়, বা কোন পুস্তকে নাই। গ্রামের পর গ্রাম-গুলি, যেন এক একখানি মূল্যবান উন্মুক্ত পাঠ্য পুস্তক। দেখিয়া শিখিয়া লও। এমন উপদেশ, আর দুনিয়ার কোথাও কোন বিদ্যা-লয়ে পাইবে না। এ সকল জীবন্ত পাঠ্য পুস্তক! আমরা দেশের সকল দিক দেখিয়া, বিচার করিয়া, প্রত্যক্ষভাবে তুলনাসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা, যাহা শিক্ষা করিতেছি—ইহা একটা নূতন বিজ্ঞান—সম্পুর্ণ নূতন বিজ্ঞান। ধীরে ধীরে, পরে পরে, মানবজীবনের বৈচিত্র্য, হাব ভাব, চাল, চলন, কৃষি-ধর্ম্ম-শিক্ষার শত ধারা, বেশ সুন্দর প্রণালীতে সাজান রহিয়াছে। মানব চরিত্র শিক্ষার এমন সহজ পন্থা আর দ্বিতীয় নাই! দেশের অভাব, দেশের উন্নতি অবনতির চিত্রগুলি, পর পর সাজান রহিয়াছে। মানব প্রকৃতির সমতা ও বৈষম্য, কোথায় আরম্ভ আর কোথায় সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা একটা রেখা টানিয়া দেখান চলে।

ঘোষেদের রাখালী ছাড়িয়া, মা দিদি ও জ্যেঠার সঙ্গে একদিন আমি, এই মেমারির বুকের উপর দিয়া গিয়াছিলাম। এ সেই মেমারি—তখনকার দৃশ্যের সহিত, মেমারির এখনকার দৃশ্যের যেন কিছুই মিল নাই। তখন দেখার মত দেখিতে শিখি নাই—তাই বুঝি

তখনকার মেমারিকে চিনিতে পারি নাই! সেই দুর্ভিক্ষের দিনে, প্রেতের যে তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়াছিলাম—মৃত্যুর বিষাণ রব শ্রবণ করিয়াছিলাম—আজ তাহা নূতন ভাবে নূতন ধরণে শুনিলাম। সেই এক ভাবই—ভিন্ন রূপে দেখিলাম। প্রভেদ কিছুই নাই! সেই মৃত্যুর বিষাণ রব আজিও মানব কণ্ঠে রহিয়াছে—ইহা পতনের রব।

আজ আমি, আমার জন্মভূমির সন্নিকটে আসিয়াছি। অনেক-দিন হইল, আমি জন্মভূমির চরণপ্রান্ত হইতে বিদায় লইয়াছি। এই দীর্ঘ জীবন কালের মধ্যে, এমন অবকাশ হয়নাই যে জননী জন্মভূমিকে মনে করি, একবার দেখি। হয়ত দু-পাঁচবার মনে করিয়া থাকিব। সে ভাব হৃদয়ে অধিক সময় স্থায়ী হয় নাই। মুখে বলি, কাগজে লিখি যে, বঙ্গদেশ আমার জন্মভূমি। বিশ্বপ্রেমের তুফান, আমার হৃদয়ে বারকয়েক উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করিয়া ছিল—সেই মহাতরঙ্গাঘাতে আমার ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যে মহৎ-সাড়া দিয়া গিয়াছে—আমি এই বৃদ্ধ বয়সে, সেই মহান্ বিশ্বপ্রেমের মধুর সঙ্গীত লহরী, হৃদয় মধ্যে নৃত্য করিতেছে—অনুভব করিতেছি। কিন্তু তত্রাচ আমার এই জন্মভূমি—সেই স্বাধীনপুরের ক্ষুদ্র তৃণ-গৃহটীর কথা মনে পড়িলে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে! বহু পরিশ্রমে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টীকে প্রশস্থ করিয়াছি—তত্রাচ যেন ক্ষুদ্রের প্রতিই ইহার প্রগাঢ় টান, প্রগাঢ় মায়া—প্রগাঢ় স্নেহ মমতায় পূর্ণ রহিয়াছে! স্বাধীনপুরের এমন কি মোহিনী শক্তি আছে—এমন কি সৌন্দর্য্য আছে, যাহাতে আমার এই কঠিন প্রাণকেও দ্রবিভূত

করিয়া ফেলিতেছে! স্বাধীনপুরের মনিববাড়ীর কথায়, কোন সুখ বা সৌন্দর্য্য নাই। তত্রাচ, তাহাই যেন প্রীতিকর বলিয়া মনে হইতেছে। বর্দ্ধমান জেলার প্রতি আমার মমতা বাড়িতেছে। স্বাধীনপুর আমার হৃদয়ে স্বর্গপুরের বিমল আনন্দ প্রদান করিতেছে। বর্দ্ধমানের মৃত্তিকা, জল, বায়ু, আকাশ যেন আমার কত ভালবাসার সামগ্রী বলিয়া মনে হইতেছে! এরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অনেক দিন দেখিনাই বলিয়া মনে হইতেছে! এখান্‌কার মাঠ, ঘাট, পথ, গাছ-পাতা, তৃণ-লতা যেন কতই স্নেহ ও মমতায় বিজড়িত! এ দেশের সকলি ভাল—আমার চক্ষে দিক্ সকল যেন উজ্জ্বল ও হাস্যমুখ বলিয়া বোধ হইতেছে! সেই প্রিয় জন্মভূমি স্বাধীনপুরের বাঁশতলার ভাঙ্গা কুঁড়েখানি একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমার সেই পবিত্র পরম পূজ্য ক্ষুদ্র ঘরখানি, এখন আছে কি নাই—তাহার কথা আদৌ মনে উদয় হইতেছে না। আমি হৃদয়ে হুবহু সেই ভাঙ্গা ঘরের উজ্জ্বল ছবিটা দেখিতেছি—সেই পথ, সেই ঘাট, সেই মাঠ, সেই গাছ সকলি যেন আমার মানস নেত্রে স্ফুটতর ভাবে দেখা দিতেছে!

যে জন্মভূমি হইতে অনাহারে হতাদরে পলাইয়া আসিয়াছি, যথায় আমাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছে—তাহার প্রতি এত উৎকট মায়া কেন? কিছুই বুঝিলাম না, এই বৃদ্ধ বয়সেও বুঝিলাম না—ইহা বুঝি বুঝিবার বা বোঝাইবার উপায় নাই! কেবল মনে মনে, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই ইহার সুধা আস্বাদন করিতে হয়!

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

বিশ্বজগতে, এতদুর সুন্দর, এতদুর মিষ্ট কথা আর নাই—সকল সৌন্দর্য্য, সকল সুধা "জননী জন্মভূমি"তে বিরাজ করিতেছে। শ্যামাপদকে বলিলাম—আমার স্বাধীনপুরে যাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে—তুমি কি আমার সহিত যাইবে? শ্যামাপদ হাস্য-মুখে বলিল—নিশ্চয় যাইব। তোমার জন্মভূমি—তীর্থক্ষেত্র! এ তীর্থ-ফল সংগ্রহ না করিয়া বাড়ী ফিরিব না। আমি বলিলাম দেখিবার মত তথায় কিছু নাই—মনে আছেত ভাই! সেখানে আমি ছোটলোক—ঘোষেদের রাখাল হারু! শ্যামাপদ বলিল, —"আমি সেই হারুর বাড়ী, হারুর জন্মভূমি দেখিব। শ্রীযুক্ত হারাধন বাবুর সহিত তথাকার কোন সম্বন্ধ নাই!"

মেমারির ষ্টেশনে গিয়া, বর্দ্ধমানের টিকিট ক্রয় করিলাম। যে দিন প্রথমে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের সহিত হুগলী যাই, সেই দিন মেমারির বুকের উপর দিয়া গিয়াছিলাম—বৈঁচির ষ্টেশনে প্রথমে রেলের গাড়ী চাপিয়াছিলাম। অনেক দিনের পরে, আজ আবার ফিরত-গোষ্ঠ আরম্ভ হইয়াছে—মেমারি হইতে বর্দ্ধমান রওনা হইলাম। রেলের গাড়ী বেগে চলিয়াছে। ঐ সেই পাতশাহী লাল সড়ক—ঐ পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। সেই দিনের কথা মনে পড়িতেছে—প্রাণটী কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে—সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষে দেশের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছিল—কঙ্কাল-সার নর নারীর শ্রেণী এই পথ দিয়াই গিয়াছিল! সেই মৃত মাতা পুত্রের শবদেহ—সকলি মনে পড়িতেছে!—আমার দেশ!

আমার জন্মভূমির অন্নাভাব, অর্থাভাব ও অধঃপতনের কথা আজ আমি যে ভাবে বুঝিতেছি—উহার যে তীব্রতা অনুভব করিতেছি—সেই দিন তাহা বুঝিতে পারি নাই! অতীতের চিত্রগুলি, অতীতের ভাবগুলি আজ আমার নিকট স্পষ্ট হইয়াছে। উহার নিদান বুঝিতেছি। যেন নূতন জীবন লাভ করিয়া দেশে ফিরিতেছি। যাহা কল্পনা করি নাই, আজ তাহা প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি!

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ি আসিবার পূর্ব্বেই, ঐ অনতিদূরে আমার স্বাধীনপুর দেখা দিয়াছে! সেই মাঠ—সেই পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপরের অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষগুলি যেন সেইরূপই দাঁড়াইয়া আছে—রাখালেরা সেই দিনের মত, গোরুর পাল লইয়া রেলগাড়ী দেখিতেছে—তাহাদের প্রতি আমার বড় স্নেহ হইল—কেন হইল, তাহা বলিতে পারি না। উহাদের মধ্যে একটা মুখও আমার পরিচিত নহে—তত্রাচ যেন কত ভালবাসার মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি শ্যামাপদের হাত ধরিয়া বলিলাম—"ঐ দেখ ভাই! আমার গোচারণ মাঠ, ঐ বটগাছের ডালে বসিয়া দোল খাইতাম! ঐ রাখালদের মত, রৌদ্রে গামছা মাথায় দিয়া দৌড়াইতাম!" আমাদের সম্মুখের বেঞ্চে একজন ভদ্র লোক বসিয়াছিলেন। তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কি জিজ্ঞাসা করিবেন, এই ভাব দেখাইতেছেন, আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম—মহাশয়! ঐ আমার জন্মভূমি স্বাধীনপুর! ঐ মাঠে আমি গরু চরাইতাম—সে দিন বড় প্রিয় ছিল মহাশয়!

ঐ দেখুন ক্ষুদ্র বাঁকানদী—ঐ বাঁকার তীরে গরুর পাল রাখিয়া, ঐ গাছের তলায় বসিয়া গান গাহিতাম। আজ অনেক দিনের পরে, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জন্মভূমির দেখা পাইয়াছি—আজ আমার বড় আনন্দের দিন মহাশয়! তিনি বলিলেন—"আমি আপনাকে চিনি—কিন্তু এতদূর সরল তাহা জানিতাম না। আপনার কঠোর কর্ত্তব্য পরায়নতার পরিচয় পাইয়াছি এবং অহঙ্কারহীন সরলতার পরিচয়ও অদ্য পাইলাম।" গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশনে থামিল। আমি ও শ্যামাপদ ষ্টেশনে নামিলাম—ভদ্র লোকটী আমাদের সহিত নামিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে বটতলার দোকানে বসিলাম—কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার অভিপ্রায়। ভদ্র লোকটী আমাদের সহিত বসিলেন—জলখাবার খাইতে খাইতে আগন্তুক বন্ধুটী বলিলেন—হারাধন বাবু! আপনি কি এখন স্বাধীনপুর যাইবেন? আমি বলিলাম—আজ্ঞে হাঁ! তিনি বলিলেন—হারাধন বাবু, আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আমি বলিলাম—সাধ্য হইলে অবশ্য রাখিব।

"অদ্য আমার বাসায় চলুন! কল্য বাড়ী যাইবেন। আপনার সহিত আমার পরামর্শ আছে।"

আমি অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত বলিলাম—জন্মভূমি দেখিবার বড়ই সাধ হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন।

"তাহা আমি বুঝিয়াছি—কিন্তু আমি আপনার আগমন নিরর্থক হইতে দিব না। কল্য স্বাধীনপুরে গিয়া, একটী পাঠশালা স্থাপন করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। আপনিই উহার স্থাপয়িতা

হইবেন। আমি স্কুল বিভাগের ডেপুটী ইনেসপেক্টার। আপনার মত লোক না হইলে, দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িবে না।”

আমি আমার স্বাধীনপুরে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠিলাম, এবং বলিলাম—আপনার মহান্ অনুগ্রহ। স্বদেশবাসীগণের প্রতি আপনার আন্তরিক টান আছে—নতুবা পাঠশালার কথা কেন বলিবেন! যাহাই হউক আপনি মহাশয় ব্যক্তি, চলুন আপনার বাসায় যাই। আমি এই বলিয়া শ্যামাপদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। শ্যামাপদের তাহাতে সম্মতি আছে, বুঝিলাম। ব্রজসুন্দর বাবু একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলেন। তিন জনে গাড়িতে উঠিলাম—গাড়ী সহরের দিকে চলিল।

স্কুল ইনেসপেক্টার ব্রজসুন্দর বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। আহারাদি হইল। তৎপরে একত্রে বসিয়া গল্প আরম্ভ হইল। তিনি হুগলীর বিদ্যালয়ের কথা হইতে কথা আরম্ভ করিয়া বলিলেন—আপনার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় দেখিয়া অবধি ঐ প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অন্যবিধ, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই—আর দেশের লোকেরাও ঐ প্রকার শিক্ষার সুফল আজিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। আমি স্কুলগুলি দেখিয়া বেড়াই, কিন্তু সকল স্থলেই একটা মহান্ অভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান শিক্ষার দ্বারা যে ইষ্টলাভ হয় না, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। দেশের লোকেরা কৃষি,

শিল্পে অনাদর করিয়া, তাহাদের বংশধরগণকে যে কুশিক্ষা দিতেছে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। দেশের অভাব না বুঝিয়া, কোন কার্য্যে অগ্রসর হইলে অন্ধকারে হাতড়াইয়া চলিয়া, শেষে গর্ত্তে পড়ার মত পড়িতে হয়। সকলেই বাবু, সকলেই চাকর হইবে। শ্রমকাতরতা পূর্ণ মাত্রায় দেখা দিয়াছে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি,—কেবল উঞ্ছ চাকরী বৃত্তিতে যে হইবে না তাহা কেহ বুঝিতে চায় না! কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য ব্যতীত দেশ কথনই উন্নত হয় না। দাস-কর্ম্ম দ্বারা আত্মসুখ কিঞ্চিৎ হয় বটে। কিন্তু দেশটাকে, ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। পাঠশালা হইতে কৃষি, শিল্প আরম্ভ করিয়া, স্কুল কলেজের শিক্ষার মধ্য দিয়াও উহার খরস্রোত প্রবাহিত করিতে না পারিলে—দেশের পক্ষে মঙ্গল নাই! তাহা দেশবাসীগণ বুঝিতেছে না! আপনি যে নিয়মে বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন—নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন—ইহাতে দেশের প্রভূত হিতসাধিত হইতেছে। পাশ্চাত্যদেশে যে প্রথায় বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়—এদেশে তাহা হইতেছে না।—এদেশে গোলাম প্রস্তুত হইতেছে, মানুষ গড়িয়া উঠিতেছে না। বোধ হয়, এদেশের জল বায়ুর গুণেই এই প্রকার হইতেছে।

শ্যামাপদ তাঁহার সহিত সুর মিলাইয়া বলিল—দেশে একদিন সুবাতাস বহিবে—দেশের লোকের মতিগতি ফিরিবে। ইহার প্রমাণ—আপনি কৃষি, শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য, নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। এখন দেশবাসীর

ঘুম ভাঙ্গেনাই! দশের কাজে দেশের লোকে হাত দিতে চায় না। সকলেই স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যা ও পরিবারবর্গের সুখ চায়। তাই পায় না! দশের জন্য, দেশের জন্য সুখ চাহিতে হইবে—তবে নিজের সুখ স্থায়ী হইবে। এখন ভবিষ্যৎ কালের উপর, খেয়ালের উপর মন ঘুরিতেছে। ঐ ঘুরো মন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে দিন বর্ত্তমান-কালের উপযুক্ত হইয়া ঘরমুখো হইবে, সেইদিন দেশের প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইবে।

ব্রজসুন্দরবাবু বলিলেন—কবে কে ঘরমুখো হইবে, সেই আশায় আর বসিয়া থাকা নিরাপদ নহে। যে দুই এক জন ঘরমুখো হইয়াছে তাহাদিগকে একত্র করিয়া কাজে নামান চাই। "নয়মন তেলও পুড়িবেনা, রাধাও নাচিবেনা"। দুর্গাবলে নেমে পড়তে হবে। শিক্ষার দিক্ দিয়া আসরে নামিতে হইবে। অর্থকরী, কার্য্যকরী বিদ্যার প্রচার করা চাই! নতুবা সকলি ফাঁকা আওয়াজ! ভদ্র-কৃষক সকলকেই শিক্ষার দ্বারা উন্নত করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেই হইবে। বর্ত্তমান অবস্থার উপর শিকড় চালাইতে আর দেওয়া হইবে না। নাড়িয়া স্বতন্ত্র স্থলে গাছ পুতিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থার উপর অভক্তি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতি ভক্তি—যতদূর পারা যায় বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। কৃষি-বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়—বাণিজ্য-বিদ্যালয় লইয়া সাধারণ বিদ্যার আদর বাড়াইতেই হইবে। তাহা হইলে দেশের লোক সুপথ পাইবে, ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের পন্থা দেখিতে পাইবে। অমঙ্গলগুলো লইয়া অলক্ষ্মী বিদায় হইবেন।

রাজলক্ষ্মী প্রতি গৃহে গৃহে পূজিতা হইবেন। হারাধনবাবু আমাদের মুরুব্বী, আপনাকে পাইয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি।

সন্ধ্যার পর কতিপয় ভদ্রলোক ব্রজসুন্দর বাবুর বাড়ী বেড়াইতে আসিলেন। এই উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধুর সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল। ভবিষ্যতে তাঁহাদের দ্বারা দেশের বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। আমি তাঁহাদের নিকট, হুগলী কৃষি ও নৈশবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, বাণিজ্যবিদ্যালয়ের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সকল কথাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম।

তাঁহারা আজিও আমার বন্ধু রহিয়াছেন—সকলেই দেশের মধ্যে মহৎ কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বর্দ্ধমান আসা সার্থক হইয়াছে। আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে, নতুবা ব্রজসুন্দর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে কেন! ব্রজসুন্দরবাবু আজিও আমার পরম বন্ধু, আমার সকল কার্য্যে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রমে খাটিয়া থাকেন। তাঁহাকে না পাইলে, বর্দ্ধমানের উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। আজিও, বর্দ্ধমানের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকে হতাদর করেন না—বাবুগিরী ও অপব্যয়ের দ্বারা দুর্নাম ক্রয় করেন নাই। সকলেই কৃষক, অথচ শিক্ষিত। শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে, এমন লোক বর্দ্ধমানে নিতান্ত বিরল, যিনি কৃষিকে ঘৃণা করেন কিম্বা কৃষি বুঝেন না। সেই জন্য কৃষিভূমি বর্দ্ধমান—মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। কাঞ্চণনগর, বনপাশ-কামার-

পাড়া, জাঁবুই, রাধাকান্তপুর প্রভৃতি বহু পল্লীগুলি, শিল্প-প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে ব্রজবাবুর সহিত আমরা আমার জন্মভূমি স্বাধীনপুর চলিলাম। আমার অনুরোধে, আজ সকলে পদব্রজে চলিয়াছি। মাতৃভূমির পবিত্রক্ষেত্রে বড়লোকের মত যাওয়া শোভা পায় না। মায়ের কোলে ছেলে যেমন করিয়া উঠে, আমরা সেই-ভাবে স্বাধীনপুরে প্রবেশ করিলাম। আমি যা দেখিয়া গিয়াছি আজ তাহা নাই! অনেক লোকের বাড়ী ঘর যেখানে ছিল, সেখানে বন হইয়াছে। দিনের বেলায় শৃগাল, কুকুরের মত বেড়াইতেছে। ভাঙ্গা দেওয়াল—ভাঙ্গা ঘর, সকলি "ক্যাৎড়াপুরী" সোনার স্বাধীনপুর, একেবারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। গ্রামের এক এক পাড়ায় লোক কত! এখন তাহার কিছুই নাই! ব্রজবাবুকে বলিলাম—আমি ছেলে বেলায় যাহা দেখিয়াছি. এখন স্বাধীনপুরে তাহার কিছুই নাই—সে শ্রী, সে সম্পদ কে হরণ করিয়া লইল! ব্রজবাবু দুঃখের সহিত বলিলেন—আর কে লইবে! ব্যাটা যম লইয়াছে—যমের দূত ম্যালেরিয়া—সকলি উদরস্থাৎ করিয়াছে! বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়া—দিগ্বিজয়ী নাম! উহার দিগ্বিজয় কার্য্য ঘোররূপে দেখা দিয়াছে। এই যে স্বাধীনপুর দেখিতেছেন, ইহা এখন পরাধীনপুর, ম্যালেরিয়ার সংগ্রামস্থল। পরাভূত নর-নারী, বালক বালিকা ও শিশুর পঞ্জরে সমাকীর্ণ। গ্রামের "ধর্ম্মতলায়" আসিলাম, ছেলেবেলায় ধর্ম্মের গাজন দেখিতে আসিতাম, লোকে লোকারণ্য হইত। কত দোকানপাট বসিত,

ধর্ম্মঠাকুরের ছোট একটী দালান ঘর ছিল—এই কয়েকবৎসরের মধ্যে, ধর্ম্মঠাকুর ইষ্টক স্তূপের উপর, ঘেটুবনের মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছেন।

ধর্ম্মতলার সে শ্রী, সে শোভা আদৌ নাই। নিকটে একটী বড় মস্‌জেদ্ ছিল—সেটা ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গিয়াছে—ইষ্টক স্তূপের উপরে বড় বড় অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া স্থানটাকে গভীর বনের মত করিয়া রাখিয়াছে। আর কেহ এখানে নামাজ পড়িতে আসে না! আর আজান্ দেয় না! যে পুষ্করিণীতে গ্রামের ইতর ভদ্র স্নান করিত, যাহার জলপান করিত—সেই কাক চক্ষুবৎ চল্‌চলে জলের উপর ইঁন্দুরকাণী পানায়, পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, হাতে করিয়া পানাদাম সরাইয়া লোকে স্নান করিতেছে। সেই পচাজল, কলসী করিয়া স্ত্রীলোকেরা গৃহে লইয়া যাইতেছে। এই কদর্য্য পচা জল খাইয়া, স্বাধীনপুরের লোক যে, আজিও বাঁচিয়া আছে—ইহাই আশ্চর্য্য! গ্রামের রাস্তাগুলি অপরিষ্কার ও নিম্ন হইয়া ড্রেনে পরিণত হইয়াছে। ভদ্র পল্লীর শ্রী আদৌ নাই—দালান বাড়ীর চূণ বালি উঠিয়া গিয়াছে। ফাটিয়া ফুটি-ফাটা হইয়াছে। বটগাছ জন্মিয়াছে, ঘাসে ছাইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যেই লোকে বাস করিতেছে। রন্ধনের ধূম উঠিতেছে। দেওয়ালের ফাটালে ফাটালে "সাপের খোলস" ঝুলিতেছে। চামচিকা চিঁ চিঁ করিতেছে। বড় বড় মাটীর বৈঠকখানা ঘর-গুলা—খড়ের অভাবে ছাওয়া হয় নাই। অথবা লোকাভাবে বা অর্থাভাবে, উহারা ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতেছে।

অধিকাংশ পল্লীবাসীর প্রাচীরে খড় নাই—ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শিব মন্দিরের কপাট নাই—চামচিকায় বাসা করিয়াছে। আবর্জ্জনায় মন্দিরাভ্যন্তর পূর্ণ রহিয়াছে। ভদ্র পল্লীর নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। স্ত্রীলোক ও কতিপয় বালক বালিকা ছাড়া, আর কাহার দেখা পাইলাম না। কামার পাড়ায়, আর লোহা পেটার শব্দ উঠে না। তাহারা প্রায় ফৌত হইয়াছে। গয়লাপাড়া হইতে আর পূর্ব্বেকার মত গোরুর পাল বাহির হয় না। ছুতার পাড়ার চিঁড়েকোটার ঢেঁকীর শব্দ নাই! সকলি যেন নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে। এই সেই স্বাধীনপুর! হায়! হায়! এতাদৃশ দুর্দ্দশা কেন হইল! উগ্রক্ষত্রিয় পাড়ার মধ্যে, বড় বড় মরাই দেখিলাম—লক্ষ্মীর শ্রীতে সেই পল্লীটী যেন উজ্জ্বল রহিয়াছে। তাহারা কৃষক, পরিশ্রমী—বিলাসী বা বাবু নহে—বিদেশে চাকরীর চেষ্টায় যায় নাই। তাই, তাহারা গ্রামটীকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং নিজেরাও সজীব ও কর্ম্মঠ রহিয়াছে। চাকুরে বাবুদের অর্থ—দেওয়ালে ও খেয়ালে—অপব্যয় হইয়া যায়। বাপ, পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া—চাষের জমি ভাগে দিয়া—সহরে সামান্য বেতনে চাকরা করিতে ছুটিয়া যান—তাই দুর্দ্দশা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করে!

দেখিতে দেখিতে গ্রামের পূর্ব্ব পাড়ায় প্রবেশ করিলাম—এ পল্লীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ। আমার মনিব বাড়ী এই পাড়ায় ছিল। আর একটী মোড় পার হইলেই আমার মনিব বাড়ী দেখা যাইবে। ব্রজসুন্দর বাবু বলিলেন—এই স্থানেই আমার একটু কাজ

আছে। আমার মনে পড়িল এটা 'বোসেদের' বাড়ী। এ বাড়ীটী মন্দ নয় প্রচীরে খড় আছে। সদর দরজাটী ভাঙ্গা নয়! সদর বাড়ীর উঠানে ঘাস নাই, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ব্রজসুন্দর বাবু বোসেদের সদর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, আমরা দুজনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলাম। আমার মনে হইল 'হরি-পালের রায় মহাশয়দের বাড়ীর মত ব্যাপার না ঘটিলে হয়! যাহাই হউক আমি সাবধানে থাকিব। দেখিতে দেখিতে ব্রজবাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা সেই বৈঠকখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বৈঠকখানার দরজা উম্মুক্ত হইল। ব্রজবাবু হাসিতে হাসিতে ডাকিলেন—আসুন, অধীনের গৃহে পদার্পণ করুন—আমার গৃহ পবিত্র করিব বলিয়া আজ আপনাদিগকে ভুলাইয়া আনিয়াছি। আসুন চিন্তা নাই এই বাড়ী আমার। শ্যামাপদ বলিল—ব্রজবাবু, হারাধন আপনাকে আদৌ চিনিতে পারে নাই। বড়ই আশ্চর্য্য! দেশের মানুষ চিন্‌তে পাল্লে না হে! তুমিই বা কেমন! আমি আর কি বলিব। "দেশের লোক হইলে কি হয়? দেশের লোক যদি দেশের লোককে চিনিতে পারিত তাহা হইলে কি দেশের এমন দুর্দ্দশা হইত!" ব্রজবাবুর গৃহে, আমার জন্ম ভূমিতে আজ আমি অতিথি হইলাম। "নিজ-বাসভূমে পরবাসী" হইলাম। এ এক অপূর্ব্ব আনন্দ! আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। সেই স্বাধীনপুর কি করিয়া এমন হইল! ব্রজবাবুর মত লোক এ স্বাধীনপুরে কি করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমার মনিব অভয় ঘোষ আর এই

আমাদের পাড়ায় প্রবেশ করিলাম। যে বাঁশবনের তলায় ডোবার ধারে আমার প্রিয় কুঁড়ে ঘরটী ছিল তথায় যাইয়া দেখি কিছুই নাই! দেয়ালের চিহ্ন মাত্র নাই—বাঁশ ও সিমুল গাছ হইয়াছে। আমি সেই মাটীর উপর বসিয়া পড়িলাম। পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয়কে তোলপাড় করিতে আরম্ভ করিল।

এব্রাহিম ও আমি আমাদের পাড়ারভিতরে প্রবেশ করিলাম। দুই এক জন লোককে চিনিতে পারিলাম। এব্রাহিম—একজনকে ডাকিল—কেষ্টাখুড়ো? কেষ্টাখুড়ো বলিল—কি এব্রামিঞা—এস! আমরা তাঁহার বাড়ী যাইলাম। এব্রাহিম কেষ্টাখুড়োকে বলিল—খুড়ো এই লোকটাকে চিনিতে পার? কেষ্টাখুড়ো আমাকে চিনিতে পারিল না। যদিও আমার গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই, মাথায় টেরি নাই তত্রাচ কেষ্টাখুড়ো আমাকে চিনিতে পারিল না। মিঞাসাহেব বলিলেন—এ যে তোমাদের হারু গো! ঘোষেদের রাখাল হারু। খুড়ো পরিচয় পাইয়া আমাকে চিনিতে পারিল। কেষ্টাখুড়ো আমাদের স্বজাতি ও কৃষাণ—গোলাম! ঘরখানির অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। আমাকে ভাত খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। আমি আহার করিয়াছি তত্রাচ কেষ্টার গৃহে আহার করিলাম। আহারের কথা আর বলিব না। পাড়ার মধ্যে যাহারা আছে সকলেই মাতলামি করিতেছে। অনেকগুলি আমার ছোটলোক আত্মীয়গণ আমাকে দেখিতে আসিল। লেখাপড়ার কথা শুনিল—এব্রাহিম-মিঞা বলিলেন—তোমাদের হারুর মত বিদ্বান এ পাড়ায় না ই

তাহারা তাহাতে আনন্দিত হইল দেখিলাম। প্রত্যেক ছোটলোক ভাই, ভগ্নীর সহিত দেখা করিয়া, নানারূপ কথা বলিয়া সন্ধ্যার সময় ব্রজবাবুর বাড়ী আসিলাম। পথের ধারে আমার মনিব বাড়ী দেখিলাম। সেই সদর বাড়ী যেখানে চটিজুতা করিয়া আমার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিলেন—সেই স্থানটী দেখা গেল। মনিব ও মনিবগিন্নীকে মনে পড়িল।

সন্ধ্যার পর আমার ছোট-লোকের পাড়ার অনেকগুলি পুরুষ আমাকে দেখিতে আসিল—আমি পূর্ব্ব হইতেই একখানি মাহুর বিছাইয়া তাহাতে বসিয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তাহারা আসিয়া মাহুরে বসিতে সাহসা হইল না। ব্রজবাবু ও আমার বহু অনুরোধে তাহারা আমার নিকট বসিল।

আমার ছোটলোক ভাই সকল আমার নিকট বসিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। তাহারা আমাকে ভদ্র মনিবের দলে ফেলিয়াছে বুঝিলাম। তাহাদের সহিত মাখামাখি ভাবে কথাবার্ত্তা ও আলাপ আপ্যায়িত করিয়া, তাহাদের মনের সেই ভাবটার পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলাম। হুগলীর চট্‌কলের গোলামদিগের ন্যায় স্বাধীনপুরের ছোটলোক সমাজের হৃদয়ে কপটতা নাই—ইহারা বড়ই সরল। বাবুগিরী নাই। ইহারা যে ভদ্রবংশাবতংশ নহে তাহা প্রতি চালচলনে দেখাইতেছে কিন্তু হুগলীর ছোটলোক বন্ধুগণ, এক একজন ধনী বা ভদ্রের বংশাবতংশ ইহা কথায় কথায় প্রকাশ করে। উভয়ের মধ্যে এই পৃথক ভাব সর্ব্বপ্রথমে দেখিলাম।

ব্রজবাবু, এব্রাহিম ও সামন্ত সমবেত গ্রামবাসীকে নৈশ-বিদ্যালয়, শ্রমজীবী-বিদ্যালয়, কৃষি-বিদ্যালয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা বিদ্যালয় ও শিল্পাগার প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিল। তাহারা দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যালয়গৃহ প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইল। সে রাত্রের মত বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি ও শ্যামাপদ একমাস কাল স্বাধীনপুর ও পরিপার্শ্বিক পল্লীনিচয়ে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিলাম এবং মাঠের ধারে তিনখানি বড় বড় মেটে ঘর প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলাম। ব্রজবাবুর গৃহে নৈশ-বিদ্যালয় ও শ্রমজীবী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আমার একজন ডাক্তার বন্ধুকে আনাইয়া সেই বিদ্যালয়-গৃহে দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হইল। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও চিকিৎসক। তাঁহাকে পারিপার্শ্বিক পল্লীগুলি পরি-ভ্রমণ করিয়া শ্রমজীবিগণকে উৎসাহিত করিতে হয়। আমরা এই একমাসের মধ্যে চারিহাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তিন মাসের মধ্যে ব্রজবাবু, সামন্ত ও এব্রাহিমের চেষ্টায় বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মিত হইল। কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইল—ক্ষুদ্র শিল্পাগার স্থাপিত হইল। আমার হুগলীর বিদ্যালয় হইতে কতিপয় শিক্ষক-ছাত্র তথায় আগমন করিলেন। আজ কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে ইহার মধ্যেই চামড়ার ব্যবসা, পশুপালন, হাঁস পালন, মিস্ত্রীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কৃত হইয়া মাছের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। যৌথকারবার হিসাবে

দোকান হইয়াছে। ছোটলোক মহলে তরিতরকারীর কৃষি করিতেছে। মাছের চাষ করিতেছে, গোলামীর নেশা ছুটিতেছে। অন্নসংস্থানের উপায় হইয়াছে। অথচ ভদ্র মহলে জন মজুরের অভাব হয় নাই। মদ ও তাড়ী বড় একটা কেহ খায় না।

পারিপার্শ্বিক পল্লীগুলি স্বাধীনপুরের আদর্শে কর্ম্মঠ হইয়া উঠিতেছে। প্রতি পল্লী হইতে তরিতরকারী, দুগ্ধ, মৎস্য বর্দ্ধমানের বাজারে আমদানি হইতেছে। পল্লীর পথঘাট পরিষ্কৃত ও উন্নত হইয়াছে। এখন একটি পুষ্করিণী ও পানা বা দলদামে পূর্ণ নাই। পল্লীপার্শ্বে কলাবাগান, আমবাগান ও ফসলের ক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বহুপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে বারইয়ারীর আমোদ হয়। তাহাতে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী বসে। বারইয়ারীর টাকা হইতে রাস্তা ও ড্রেন বৎসর বৎসর পরিষ্কার হইতেছে। মাঠের মজা ও ভরাট পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার হইতেছে। কৃষির জন্য জলের অভাব হয় না। মৎস্যের দ্বারা সেই সকল পুষ্করিণীর আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি মধ্যে মধ্যে সকল বিদ্যালয়গুলি একবার পরিদর্শন করি। প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ চিকিৎসা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া সম্মিলনী বসে, তাহাতে ছাত্র, শিক্ষকগণ যোগদান করেন। ভাবের আদান প্রদান হয়। "ম্যালেরিয়াসঙ্ঘারাম" নামে কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধি দ্বারা ম্যালেরিয়া বিমোচনের

উপায় তাঁহারা করেন। দেশের শিল্প ও শিল্পীর আদর বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং "ম্যালেরিয়া সঙ্ঘারাম" নামে একখানি মাসিক পত্র সঙ্ঘারামের কর্ম্মীগণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা যথাসাধ্য দেশের হিতকল্পে আজিও কর্ম্ম করি। আমাদের অপেক্ষা উপযুক্ত বহু যুবক কর্ম্মীর অভ্যুদয় হইয়াছে। ক্ষুদ্র হইতে মহৎ উৎপন্ন হয়! আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি ক্রমশঃ মহৎ শক্তিলাভে বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। এক বহু হইয়াছে। আমার সৌভাগ্যের কাহিনী বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিব না। ইহাতে শিক্ষার কিছুই নাই। তবে আমার যথাসর্ব্বস্ব দেশহিতকর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিয়াছে। ওকালতী করিয়া ও চেয়ারম্যান হইয়া আমি দেশের উপকার ও উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবনের ব্রত এই প্রকার কঠোর সাধনার দ্বারা উত্থাপিত হইতেছে। আজ সমস্ত বঙ্গদেশে শিক্ষার সাড়া পড়িয়াছে। ছোটলোক সমাজকে উন্নত করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধানে যত্ন দেখা যাইতেছে। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে এখন ফসলের ক্ষেতে, তরিতরকারীর ক্ষেতে অবকাশমত কাজ করি—বিদ্যালয়গুলি দেখি। নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা করি। এক্ষণে আমার বহু কর্ম্মী-বন্ধু জুটিয়াছে। তাঁহারা ধন্য হউন! দেশবাসী ধন্য হউক!

পরিশিষ্ট

দেশকে উন্নত করিতে হইবে বলিলে চলিবে না—উন্নত করিব—করিতেছি—বলিতে হইবে। কথায় কাজ হইবে না—যাঁহার যতটুকু সামর্থ্য তাঁহাকে ততটুকু দেশের সেবায় দান করিতে হইবে। আমরা দেশের উন্নতিকল্পে স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য। নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। উপযুক্ত কর্ম্মী পাইলে দেশবাসী আজিও অকাতরে অর্থ ও সাহায্য দান করিতে পারেন, ইহা মনে রাখিতে হইবে। নিজের সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যিনি দশের সেবা করিবেন—তাঁহার লোকবল অর্থবল কিছুরই অপ্রতুল হইবে না। আমি আমার নিজের জীবনেই তাহা উপলব্ধি করিতেছি।

ছোটলোক, চাষা, ভূষা, কুলী, মজুরদিগকে ঘৃণা করিওনা—ভাই বলিয়া তাহাদিগকে কোলে লও। জাতীয় বল বৃদ্ধি হইবে, দেশ উন্নত হইবে। স্বীয় স্বীয় যশের জন্য লালায়িত হইলে কর্ম্ম পণ্ড হইবে। কোন ধর্ম্মের নিন্দা বা প্রশংসার মধ্যে প্রবেশ করিবে না—

"ত্যাগবলং পরং বলম্।"

আমার এই জীবনীটী কাহিনী নহে। প্রকৃত ইতিহাস। দিব্যচক্ষে যিনি দেখিবেন, মন দিয়া যিনি পাঠ করিবেন তিনি

আমার দেখা পাইবেন। স্থান, কাল, পাত্রের নাম গোপন রাখিয়া "বঙ্গীয় পতিতজাতির কর্ম্মী" লিখিত হইল। ইহা কাহিনী নহে! সত্য ঘটনা। যিনি দশের সেবায় কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিবেন, ছোটলোক জাতির উন্নতি বিধানে চেষ্টা করিবেন তিনিই এই ইতিহাসের সত্যরূপ দর্শন করিবেন।

ম্যালেরিয়া সঙ্ঘারামের কথাও অলীক কাহিনী নহে। কর্ম্মী হইলেই কর্ম্মের সন্ধান পাইবেন। নচেৎ সহস্র বৎসর অন্বেষণ করিলেও ম্যালেরিয়া সঙ্ঘারামের সন্ধান পাইবেন না। যথাসময়ে ম্যালেরিয়া সঙ্ঘারামের রিপোর্ট বাহির হইবে। রিপোর্ট পড়িলেই বুঝিবেন—ম্যালেরিয়ার উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছে। কর্ম্মী হও—কর্ম্ম কর—ত্যাগের পথে যতটুকু পার চল। কর্ম্ম না করিলে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া না তুলিতে পারিলে দেশ জাগিবে না। সরল ও সত্যপথে চলিতে হইবে। কু-অভিপ্রায়কে হৃদয়ে স্থান দিবে না। রাজা যিনি তিনি, নিশ্চয় নরদেবতা। তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিয়া স্বদেশ-সেবায় মনপ্রাণ অর্পণ কর। আমি এখন দেশের কাজে নিযুক্ত রহিয়াছি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের সেবা করিব। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। বিস্মৃতিই আমাদিগকে অবনত করিয়াছে। আমার জীবনের শেষ পরিচয় গুপ্ত রাখিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব। আমি দেশের নিকট চির অজ্ঞাত থাকিব।

সমাপ্ত।